ইসলামের দৃষ্টিতে
জন্মনিয়ন্ত্রণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
অনুবাদ ঃ আবদুল খালেক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

"ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর লিখিত একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই। নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাস বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নয়, বরং যুক্তি-বুদ্ধি, বিজ্ঞান-পরিসংখ্যান এবং সমকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এর যথার্থতা নিরূপণ করেছেন। এর পাশাপাশি কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বইটি ১৩৫৪ হিজরী; ঈসায়ী ১৯৩৫ সালে লিখেছেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর সম্পাদনা করেন ও প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট যোগ করেন। ১৯৬৭ সালে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর পঞ্চম সংস্করণ আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশ করছে।

প্রতিদিনের পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার অসারতা ও ব্যর্থতা প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" বইতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে বর্তমান সভ্যতার মৌলিক ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। আমরা আশা করি সচেতন পাঠক ও সুধীজনের চাহিদা পূরণে তা সক্ষম হবে।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

বর্তমান পরিস্থিতি

পাক-ভারত উপমহাদেশে গত সিকি শতকের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ (Birth Control)-এর আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।[১] এর সমর্থনে প্রচার কার্য চালানো, মানুষকে এর প্রতি আকৃষ্ট ও এর বাস্তব কর্মপন্থা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার জন্যে সংস্থা কায়েম করা হয়েছে এবং পুস্তাকাদিও ছাপানো হয়েছে। সর্বপ্রথম লন্ডন বার্থ কন্ট্রোল ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টারের ডাইরেক্টর মিসেস্ এডিথ হো মার্টিন (Mrs. Edith How Martyn) এ আন্দোলনের প্রচারের জন্যে এদেশ সফর করেন। পুনরায় ১৯৩১ সালে আদমশুমারীর কমিশনার ডাঃ হাটন (Dr. Hutton) তাঁর রিপোর্টে ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারত সরকার সে সময় উক্ত প্রস্তাব বাতিল করে দিলেও মহিলাদের এক নিখিল ভারত সংস্থা লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে এর সমর্থনে একটি প্রস্তাব পেশ করে। করাচী ও বোম্বাই পৌরসভায় এর বাস্তব শিক্ষা প্রচারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। মহীশূর, মাদ্রাজ ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে এজন্যে ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। এসব ব্যাপার থেকে পরিষ্কার বোঝা গেলো যে, পাশ্চাত্য দেশ থেকে আগত নানাবিধ বিষয়ের সঙ্গে এ আন্দোলনও নিশ্চিতরূপে এদেশে বিস্তার লাভ করবে। এরপর হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুটি আজাদ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং উভয় দেশ নিজ নিজ জাতীয় কার্যসূচীর মধ্যে এ বিষয়টিকে শামিল করে নেয়।

হিন্দুস্থান নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেই দাবী করে। তাই তার কোন জাতীয় কর্মসূচীর জন্যে ধর্মীয় অনুশাসনের সমর্থন জরুরী নয়। কিন্তু পাকিস্তান আল্লাহ্র রহমতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এজন্যেই এখানে এ আন্দোলনকে ইসলামী আদর্শের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। এর পরও যদি ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নীরব থাকে তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে

---

১ এখন এ আন্দোলনের নাম 'পরিবার পরিকল্পনা' (Planned Parent hood)। আমেরিকায় সর্বপ্রথম এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন এ নামে পরিচিত হয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালে আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোর ফেডারেশনের নাম Birth Control Federation of America (আমেরিকার জন্মনিয়ন্ত্রণ ফেডারেশন) থেকে পরিবর্তন করে Planned Parent hood Federation of America (আমেরিকার পরিবার পরিকল্পনা ফেডারেশন) নামকরণ করা হয়। (Encyclopedia Britanica, 1955, Vol. 3.)

যে, সত্য সত্যই ইসলাম জন্মনিরোধের সমর্থক অথবা অন্ততপক্ষে একে বৈধ মনে করে।

এ বিভ্রান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যেই এ পুস্তক লেখা হলো। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি আলোচনা করার পূর্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনটির স্বরূপ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ আন্দোলন কিভাবে শুরু হলো, কি উপায়ে বিস্তার লাভ করলো এবং যেসব দেশে এ নীতি অনুসৃত হয়েছে সেখানে এর ফলাফল কি, এসব বিষয় ভালভাবে জানা দরকার। এসব সামাজিক বিষয় পুরোপুরি অবগত না হলে ইসলামী শরীয়তের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা সম্ভব হবে না এবং ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভবপর নয়। এজন্যে প্রথমে আমি এসব বিষয়েই আলোকপাত করবো এবং পরে এ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগী পেশ করবো। এই সংগে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমি যেসব তথ্য পেশ করবো, দেশের সুধীসমাজ, শাসন কর্তৃপক্ষ ধীর-স্থির ভাবে সেগুলো বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমি আশা করি। সমষ্টি জীবনের সমস্যাবলী এত জটিল যে, কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে চিন্তা করা এবং একমাত্র সমাধান পেশ করে দিয়ে ক্ষান্ত থাকা কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না। একটি সমষ্টিগত সমাধানের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল দিকে সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং আলোচনা ও বিতর্কের পথ বন্ধ না করাই সমীচীন। কোন জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ কোন নীতি গৃহীত হয়ে থাকলেও বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও পুনর্বিবেচনা করা যাবে না বলে মনে কারও ভুল।

জন্মনিরোধ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও পটভূমিকা

জন্মনিরোধের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ বৃদ্ধির প্রতিরোধ। প্রাচীনকালে এতদুদ্দেশ্যে আজল, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও ব্রহ্মচর্য (অবিবাহিত থাকা অথবা স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলন পরিহার করা) অবলম্বন করা হতো। আজকাল শেষের দুটি ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং এদের পরিবর্তে এমন নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, যাতে করে যৌন মিলন বহাল রেখে ঔষধ অথবা উপকরণাদির দ্বারা গর্ভ সঞ্চারের পথ বন্ধ করে দেয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় গর্ভপাতের ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু জন্মনিরোধ আন্দোলন শুধু গর্ভ সঞ্চার বন্ধ কারার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করে। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ বিষয়-সম্পর্কিত তথ্যাবলী ও উপায়-উপাদান ব্যাপক হারে সমাজে ছড়ানো, যেন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী এর সুবিধা ভোগ করতে পারে।

আন্দোলনেরসূচনা

ইউরোপে ঈসায়ী আঠারো শতকের শেষাংশে এ আন্দোলনের সূচনা হয়। সম্ভবত ইংলন্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথ্যাস-ই (Malthus) এর ভিত্তি রচনা করেন। সে সময় ইংরেজদের প্রাচুর্যময় জীবন যাপনের ফলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার দেখে মিঃ ম্যালথ্যাস হিসাব করতে শুরু করেন যে, পৃথিবীর আবাদযোগ্য জমি ও অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান সীমিত। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাহীন। যদি স্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে পৃথিবীর বর্ধিত জনসংখ্যার তুলনায় সংকীর্ণ হয়ে যাবে-অর্থনৈতিক উপকরণাদি, তখন মানুষের ভরণপোষণের ভার বইতে পারবে না এবং মানুষের সংখ্যা বেশী হয়ে যাবার ফলে জীবন যাত্রার মান নিম্নগামী হয়ে যাবে। সুতরাং মানব জাতির স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, কল্যাণ ও শান্তির জন্যে মানব বংশ বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক উপাদান বৃদ্ধির সংগে সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে। জনসংখ্যা যেন কখনও অর্থনৈতিক উপাদানের উর্ধ্বে যেতে না পারে। মোটামুটি এ-ই হচ্ছে ম্যালথ্যাসের প্রস্তাব। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন প্রথাকে পুনর্জীবিত করার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থাৎ তাঁর মতে অধিক বয়সে বিয়ে করতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনে যথেষ্ট সংযম অবলম্বন করতে হবে। ১৭৯৮ সালে মিঃ ম্যালথ্যাস জনসংখ্যা ও সমাজের ভবিষ্যত উন্নয়নে এর প্রভাব (An Essay on Population and as it effects, the future Improvement of the Society) নামক পুস্তকে সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রচার করেন। এরপর ফ্রান্সিস প্ল্যাস (Francis Place) ফরাসী দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার প্রতি জোর দেন।

কিন্তু তিনি নৈতিক উপায় বাদ দিয়ে ঔষধ ও যন্ত্রাদির সাহায্যে গর্ভ নিরোধ করার প্রস্তাবদেন।

আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার চার্লস্ নেলটন (Charles Knowlton) ১৮৩৩ ঈসায়ী সালে এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থনসূচক উক্তি করেনঃ তাঁর রচিত 'দর্শনের ফলাফল' (The Fruits of Philosophy) নামক পুস্তকেই সম্ভবত সর্বপ্রথম গর্ভ নিরোধের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং এর উপকারিতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

প্রাথমিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ও এর কারণ

প্রথমে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা এর প্রতি কোন গুরুত্ব দান করে নি। কারণ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিলো ভ্রান্ত মতবাদ। ম্যালথ্যাস মানুষের বংশ কি হারে বেড়ে চলছে তা হিসাব করে বলে দিতে পারতেন–কিন্তু অর্থনৈতিক উপায়–উপাদান কি হারে বাড়ে এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যে লুক্কায়িত সম্পদ মানুষের আয়ত্তে এসে অর্থনৈতিক উপাদান বাড়িয়ে দেয় তার পরিমাণ হিসাব করার কোন উপায়ই তার জানা ছিলো না। চর্মচক্ষুর আড়ালে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে তা ম্যালথ্যাসের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। এজন্যে তাঁর হিসাব প্রকাশের পর এ ধরনের যে সমস্ত সম্পদ মানুষের করায়ত্ত হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি কোন ধারণা করতে পারেন নি। উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়। মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়, বিশেষত ইংলন্ডের লোকসংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, অতীত বংশ বৃদ্ধির ইতিহাসে এর নজীর নেই। ১৭৭৯ সালে ইংলন্ডের জনসংখ্যা ছিল, ১,২০,০০,০০০। ১৮৯০ সালে এ সংখ্যা ৩,৮০,০০,০০০ গিয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের সংগে অর্থনৈতিক উপাদানও অনেক বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও ব্যবসায়ের ব্যাপারে এদেশ প্রায় সমস্ত দুনিয়ার ইজারাদার হয়ে যায়। জীবন যাপনের জন্যে শুধু দেশের উৎপন্ন ফসলের ওপরই তাদের নির্ভর করতে হয় নি, বরং শৈল্পিক উন্নতির মূল্যস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের রসদ সংগৃহীত হতে থাকে এবং এত উচ্চ হারে লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা কখনও মনে করে নি যে, ভূপৃষ্ঠ তাদের খাদ্য সরবরাহ করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে–অথবা প্রকৃতির সম্পদের ভান্ডার তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

নূতন আন্দোলন

উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে নয়া ম্যালথ্যাসীয় আন্দোলন (New-Malthusian Movement) নামে এক নূতন আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৬ সালে

মিসেস এ্যানী বাসন্ত ও চার্লস ব্রাডর ডাঃ নোল্‌টনের রচিত "দর্শনের ফলাফল" পুস্তক ইংলন্ডে প্রকাশ করেন। গভর্নমেন্ট এর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করে। মোকদ্দমার প্রচার কার্যের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। ১৮৭৭ সালে ডাক্তার ড্রাইস্‌ডেল (Drysdale)-এর সভাপতিত্বে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার শুরু হয়ে যায়। দু'বছর পরে মিসেস ব্যাসন্ত-এর Law of Population (জনসংখ্যার আইন) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং প্রথম বছরেই এর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কপি বিক্রি হয়। ১৮৮১ সালে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানিতে এ আন্দোলন পৌঁছে যায় এবং ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব দেশে এ উদ্দেশ্যে রীতিমত বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয় এবং এসব সমিতি বক্তৃতা ও লেখার মারফত জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা ও বাস্তব উপায় শিক্ষা দান করতে শুরু করে। এর সপক্ষে প্রচার চালানো হয় যে, এ পদ্ধতি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু বৈধই নয়, বরং উত্তম এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু লাভজনকই নয়, বরং অপরিহার্য। এজন্যে ঔষধ আবিষ্কার করা হয়, যন্ত্রাদি তৈরী করা হয় এবং এসব ঔষধ ও যন্ত্র জনগণের জন্যে সহজলভ্য করার ব্যবস্থাও করা হয়। স্থানে স্থানে জন্মনিরোধ ক্লিনিক (Brith Control Clinics) খুলে দেয়া হয় এবং এসব ক্লিনিক থেকে বিশেষজ্ঞগণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে পরামর্শ দিতে থাকেন। এভাবে এ নূতন আন্দোলন অতি দ্রুত শক্তি অর্জন করে। বর্তমানে এ আন্দোলন ক্রমেই প্রসার লাভ করছে।

আন্দোলন প্রসারের কারণ

• মিঃ ম্যালথ্যাস যেসব কারণের ওপর ভিত্তি করে জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, বর্তমান যুগে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করার মূলে ঐ সব কারণ প্রকৃত কারণরূপে পরিগণিত হচ্ছে না, বরং পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution), পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, বস্তুতান্ত্রিক কৃষ্টি ও আত্মসুখলিপ্সু সভ্যতাই এর প্রকৃত কারণ। আমি এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক পর্যালোচনা করে কি কারণে পাশ্চাত্য জাতিগুলো জন্মনিরোধ করতে বাধ্য হয়েছে তা দেখাবার চেষ্টা করবো।

১. শিল্প বিপ্লব

ইউরোপে যন্ত্র আবিষ্কারের পর সম্মিলিত পুঁজির ভিত্তিতে বড় বড় কারখানা গড়ে ওঠার ফলে ব্যাপক উৎপাদন (Mass Production) শুরু হয় এবং গ্রামের অধিবাসিগণ দলে দলে চাষাবাদ ছেড়ে দিয়ে চাকরীর উদ্দেশ্যে শহরের পথ ধরে। অবশেষে গ্রামাঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং বড় বড় শহর গড়ে ওঠে। এসব শহরে

সীমাবদ্ধ স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হয়; এ ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই উন্নত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থার ফলেই অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। জীবন সংগ্রাম কঠোর হয়ে পড়ে। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। সামাজিকতার মান উর্ধ্বমুখী হয়। জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা দীর্ঘ হয় এবং এদের দাম এত বেড়ে যায় যে, সীমাবদ্ধ আয়ে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা বহাল রাখা অসাধ্য হয়ে পড়ে। আবাসস্থান সংকীর্ণ এবং ভাড়া বেশী হয়ে যায়। উপার্জনকারী খাবার লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিকে ভীতির চোখে দেখতে থাকে। পিতার জন্যে সন্তান এবং স্বামীর জন্যে লালন-পালন এক দুঃসহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি লোকই নিজের উপার্জন শুধু নিজেরই প্রয়োজনে খরচ করতে এবং এ ব্যাপারে অন্যান্য অংশীদারের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাতে বাধ্য হয়।[১]

২. নারীদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা

উপরোল্লিখিত অবস্থাগুলোর দরুন নারীদেরও নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য হতে হয় এবং পরিবারের উপার্জনশীলদের মধ্যে তাদেরও শামিল হতে হয়। সমাজের প্রাচীন প্রথা মুতাবিক পুরুষের উপার্জন করা এবং নারীর গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকার কর্মবন্টন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। নারীগণ অফিস ও কারখানায় চাকরী করার জন্যে হাজির হয়। আর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব গ্রহণের পর সন্তান জন্মানো ও তার প্রতিপালনের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। যে নারী নিজের প্রয়োজন পূরণ ও ঘরের বাজেটে নিজের অংশ দান করতে বাধ্য হয় তার পক্ষে সন্তান জন্মানো কি করে সম্ভব? অনেক নারীই গর্ভাবস্থায় ঘরের বাইরে দৈহিক বা মানসিক শ্রম করার অযোগ্য হয়ে যায়, বিশেষত গর্ভকালের শেষাংশে তো ছুটি গ্রহণ তার জন্যে অপরিহার্য। পুনঃসন্তান প্রসবকালে ও তার পরবর্তী কিছুদিন সে কাজ-কর্ম করার যোগ্য থাকে না। তারপর শিশুকে দুধ পান করানো এবং অন্তত তিন বছর পর্যন্ত তার প্রতিপালন, দেখাশোনা, শিক্ষা দানের কাজ চাকরীর অবস্থায়

---

১. প্রফেসর পল লিভসে নামক জনৈক আধুনিক লেখক খুবই অর্থপূর্ণ ভাষায় উপরিউক্ত কথা স্বীকার করেছেনঃ
"শিল্পভিত্তিক সমাজের মানুষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উর্বরতা সম্পর্কে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার শিকারে পরিণত হয়েছে। এমন কি এখন যৌনসম্পর্ক স্থাপনকে সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যৌন যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য বর্তমানকালে সন্তান উৎপাদন (Procreation) নয়, বরং আনন্দ উপভোগ (Recreation) বলে পরিগণিত হচ্ছে। দেখুন-Social Problems, Chicago, 1959, Page 102, Landis Paul H.

করা তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে? দুগ্ধপায়ী সন্তানকে কারখানায় বা অফিসে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেমন মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি আর্থিক অসংগতির দরুন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোনো চাকর নিয়োগ করাও সম্ভব হয় না। যদি মায়ের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে বেকার থাকতে হয় তাহলে হয় তাকে অনাহারে মরতে হবে কিংবা স্বামীর জন্যে সে এক অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। এ ছাড়া তার নিয়োগকারীও পুনঃপুনঃ সন্তান প্রসবের জন্যে তাকে ছুটিদান করা পছন্দ করবে না। মোদ্দাকথা, এসব কারণেই নারী তার স্বাভাবিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে এবং পেটের দায়ে মায়ের যাবতীয় সহজাত প্রবৃত্তিকে কোরবানী করতে বাধ্য হয়।

৩. আধুনিক কৃষ্টি ও সভ্যতা

আধুনিক কৃষ্টি সভ্যতা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, এর ফলে সমাজে সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব মানুষের মধ্যে চরম স্বার্থপরতা সৃষ্টি করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আরামের জন্যে বেশী পরিমাণ সামগ্রী সংগ্রহ করার পক্ষপাতী এবং একের রেজেকে অন্য কেউ অংশীদার হোক: এটা তারা মোটেই পছন্দ করে না। এমনকি বাপ, ভাই, বোন ও সন্তানকে পর্যন্ত এরা নিজেদের উপার্জিত সম্পদের ভোগে অংশীদার করতে রাজী নয়। ধনী ও বড় লোকেরা বিলাসিতার জন্যে এত সব উপায় উপাদান তৈরী করেছে যে, এদের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার লোভ সামলাতে পারেনি। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অনেক বিলাসোপকরণ মানুষের সামাজিক মান এত উঁচু করে দিয়েছে যে, স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোকের পক্ষে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ব্যয় ভার বহন করা তো দূরের কথা তার নিজের বাসনা চরিতার্থ করাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩]

---

৩. একজন ফরাসী লেখক প্রকাশ করেছেন, জন্মনিরোধকারী দম্পতিদের নিকট থেকে এদের এ পথ অবলম্বনের কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অধিক সন্তান ও অধিক অস্বচ্ছলতার দরুন যারা জন্মনিরোধ করে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধিক সংখ্যক লোক যে কারণে জন্মনিরোধ করে তা হচ্ছে, "নিজেদের আর্থিক অবস্থা এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করণ, নিজেদের সম্পত্তির অধিক সংখ্যক ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন রোধ, প্রিয় সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে তৈরী করণ, স্ত্রীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের ঝামেলা থেকে হেফাজত করা। নিজেদের ভ্রমণ ও চলাফেরার আজাদী বহাল রাখা যেন অনেক সন্তানের দরুন স্ত্রী শুধু শিশুদের দখলে না যায় এবং স্বামীর আনন্দ অতৃপ্ত থাকতে বাধ্য না হয়।" Paul Burcan, Towards Moral Bankruptcy, London, 1925,-Page,-46.

নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এমন একটি নূতন ভাবধারা সৃষ্টি করেছে যার ফলে নারী সমাজ তার স্বাভাবিক মাতৃত্বের দায়িত্ব এড়িয়ে চলার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করে চলেছে। এরা ঘরের কাজ এবং শিশু পালনকে এক দুঃসহ বোঝা মনে করে এবং এ কাজ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এদের দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়েই আসক্তি আছে। যদি কোন বিষয়ে এদের নিরাসক্তি থাকে তবে তা হচ্ছে তাদের ঘর, ঘরের কাজ ও সন্তান প্রতিপালন। বাইরের আনন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কষ্ট বরদাশত করা তাদের বিবেচনায় নির্বুদ্ধিতা। পুরুষদের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে থাকার জন্যে তারা শীর্ণদেহী, কোমল, কমনীয়, সুশ্রী ও যুবতী হয়ে থাকার জন্য আগ্রহশীল। এ সব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তারা বিষাক্ত ঔষধ পান করে জীবন নাশ করতেও রাজী।[৪] নিজের প্রসাধনী ও পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্য এরা কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারে; কিন্তু সন্তানদের লালন-পালনের জন্য এদের বাজেটে কোন অর্থ নেই।

কৃষ্টি ও সভ্যতা চরম আত্মসুখবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। মানুষ যত অধিক পরিমাণে সম্ভব সুখভোগ করতে চায় কিন্তু এর পরিণতিতে স্বাভাবিকভাবে তাদের উপর যে সব দায়িত্ব আসে তা বহন করতে তারা প্রস্তুত নয়। গর্ভকাল ও সন্তান প্রসবের পর সন্তান পালনকালে নিজেদের সম্ভোগ লিপ্সাকে শিথিল করা এদের জন্যে অসহনীয়। শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ভবিষ্যত জীবনে সুখ সমৃদ্ধির জন্যে অনেকেই (বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী) মনে করে যে, একটি কিংবা দু'টি সন্তানের বেশী জন্মাতে তারা ইচ্ছুক নয়। জীবন যাত্রার মান ও কল্পনা বিলাসিতা এত উর্ধগামী হয়ে গেছে যে, জীবন যাপনের উপকরণগুলো এদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। এদের এই উচ্চ কল্পনাবিলাস অনুযায়ী অধিক সংখ্যক সন্তানদের প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও জীবনের উত্তম সূচনায় Start সুযোগ দান এদের জন্যে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তথাকথিত সভ্যতা শিক্ষা-দীক্ষার উপায়-উপাদানগুলোকে অত্যন্ত ব্যয়বহুলও করে দিয়েছে।

নাস্তিকতা মানুষের মন থেকে আল্লাহর ধারণাই মিটিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তাঁর রেজেকদাতা হওয়ার উপর নির্ভর করার প্রশ্নই ওঠে না। এ ধরনের মানুষ শুধু বর্তমান উপকরণের উপর নির্ভর করে নিজেকেই নিজের ও সন্তানদের রেজেকদাতা বলে বিবেচনা করে।

---

৪ কিছু দিন পূর্বে নিউইয়ার্কের হেলথ কমিশনার এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, মহিলাগণ শীর্ণদেহী হবার জন্য (Dimitrophenol) নামক যে ঔষধ খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহার করে তা বিষাক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিষক্রিয়ায় এযাবৎ অনেক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

এসব কারণের দরুনই পাশ্চাত্য দেশগুলোতে জন্মনিরোধ আন্দোলন দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করেছে। এসব কারণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পাশ্চাত্য জাতিগুলো প্রথমেই ভুল করে তাদের সভ্যতা.সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বস্তুতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও আত্মপূজার ভ্রান্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। তারপর যখন তাদের এ-কীর্তি পূর্ণতায় পৌছে তার কুফল দ্বারা সমাজকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে তখন দ্বিতীয়বার তারা নির্বুদ্ধিতা করে বাহ্যিক চাকচিক্যময় আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে বহাল রেখে এর যাবতীয় কুফল থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছে। এরা বুদ্ধিমান হলে নিজেদের সামাজিক অত্যাচারের উৎস খুঁজে বের করতো এবং নিজেদের জীবন থেকে এসব দোষ দূর করতে চেষ্টা করতো। এরা আসল দোষের সন্ধান তো পায়ইনি বা পেয়ে থাকলেও বাহ্যিক চাকচিক্যময় সভ্যতার যাদুতে এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে যে এর সংশোধন করে কোন উন্নততর সমাজ কায়েম করতে এরা রাজী নয়। বরং এরা নিজেদের কৃষ্টি, সভ্যতা, আর্থিক ব্যবস্থা ও সামাজিকতায় ঠাঁট বজায় রেখে জীবনের সমস্যাবলীকে ভিন্নপথে সমাধান করতে সচেষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে সন্তান সংখ্যা কমিয়ে দেয়াই এদের নিকট সহজ বিবেচিত হয়েছে; যাতে করে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে নিজেদের খাদ্য ও বিলাস দ্রব্যের অংশ না দিয়ে পরমানন্দে দিন কাটানো সম্ভব হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের কুফল

বিগত ১০০ বছরের অভিজ্ঞতায় জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব ফলাফল দেখা দিয়েছে তাও আলোচনা করা দরকার। যে আন্দোলন বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে এবং যার ফলাফল বরাবর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে তার ভাল-মন্দ সম্পর্কে মতামত গঠন করার জন্যে একশত বছরের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণকারী দেশগুলোর মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে আদর্শ দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কেননা, আমাদের নিকট অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দু'দেশে সমৃদ্ধি ও তথ্য অনেক বেশী পরিমাণে আছে। আর অন্যান্য দেশের সঙ্গে এ দু'দেশের পার্থক্যও খুব বেশী নয়।

১. বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্থিত ভারসাম্য নষ্ট

ইংলণ্ডের রেজিষ্টার জেনারেলের রিপোর্ট, ন্যাশনাল বার্থ কন্ট্রোল কমিশনের অনুসন্ধান এবং জনসংখ্যা সম্পর্কিত রয়েল কমিশনের রিপোর্ট দেখে জানা যায় যে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই জন্মনিয়ন্ত্রণ সব চাইতে বেশী প্রচলিত। বেশীর ভাগই উচ্চ বেতন ভোগী কর্মচারী, উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সচ্ছল লোক এবং ধনী, শাসক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণই জন্মনিরোধ অভ্যাস করে থাকে। আর নিম্ন শ্রেণীর মজুর ও শ্রম পেশা লোকদের মধ্যে জন্মনিরোধ প্রথা না থাকারই শামিল। এদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়নি, এদের মনে উচ্চাশাও নেই এবং ধনীদের মত জাঁক-জমকপূর্ণ সামাজিকতার প্রতিও এদের কোন লোভ নেই। এদের সমাজে এখনও পুরুষ উপার্জনকারী এবং নারী গৃহকর্ত্রী। এ প্রাচীন প্রথাই এখনো এখানে প্রচলিত আছে। আর এ কারণেই এরা আর্থিক অসচ্ছলতা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নি মূল্য এবং গৃহসমস্যা সত্ত্বেও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করে না। এদের মধ্যে জন্মহার হচ্ছে প্রতি হাজারে ৪০ জন। অপর দিকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জন্মহার এত কমে গিয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডের মোট জন্মহার ১৯৫৪ সালে হাজার প্রতি ১৫৫.৩ জন ছিল। কায়িক পরিশ্রমকারীদের পরিবারগুলো বৃহদাকৃতির। সাম্প্রতিক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ১৯০০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে যেসব বিয়ে হয়েছে তার মধ্যে, শ্রমিক পরিবারগুলোর শতকরা ৪০টিই হচ্ছে বড় পরিবার।[৫]

---

৫. Britain: An Official Handbook, 1954, page-8

জনসংখ্যা বিষয়ক মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসার ওয়ারেন থম্পসন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স ও সুইডেনের জনসংখ্যার শ্রেণী ভিত্তিক পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেঃ–

> "কায়িক শ্রমকারী লোক ও শ্বেতাংগ চাকুরীজীবীদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে প্রথম গ্রুপের প্রজনন শক্তিই বেশী। কায়িক শ্রমকারীদের মধ্যেও কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় কৃষক শ্রেণীর প্রজনন শক্তি বেশী। কৃষকদের বাদ দিয়ে অপরাপর শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে তুলনা করে দেখা যায় যে, যারা কারিগরিতে বিশেষজ্ঞ নয় এবং যাদের কাজ কঠিন ও নিম্নশ্রেণীর এবং জীবন যাত্রার মান যাদের নিম্ন তাদের প্রজনন ক্ষমতা বেশী।
>
> ...... শিক্ষার মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে অল্প শিক্ষিত লোকদের পরিবার উচ্চ শিক্ষিতদের তুলনায় অনেক বড়।"[৬]

এর ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণকারী সমাজের দৈহিক পরিশ্রমকারীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা অধিক বুদ্ধি ও বিবেচনার অধিকারী, যাদের কর্ম পরিচালন ও নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা রয়েছে তাদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কোন জাতির জন্য এ ধরনের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, এর অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব। আর নেতৃত্বদানকারী লোকের অভাব দেখা দিলে কোন জাতিই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। জন্মনিরোধকারী দেশগুলো বর্তমানে যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রেণীর অভাব, সাধারণ ভাবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধোগতি এবং নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ জন্য সে সব দেশের চিন্তাবিদগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অলডাস হাক্সলী (Aldous Huxley) সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর পুস্তক Brave New World Revisited (ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড রিভিজিটেড)–এ বলেন,"আমাদের কার্যকলাপের ফলে আমাদের বংশবৃদ্ধি জৈবিক দিক দিয়ে নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের হতে চলেছে।"[৭] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ "নতুন ঔষধপত্র ও উচ্চতর চিকিৎসার প্রচলন সত্ত্বেও (এবং আংশিকভাবে এদের কারণেও) সাধারণ অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের মান জীবনতত্ত্বের নিয়ম মাফিক যে শুধু উন্নত হয় না তাই নয়–বরং নিম্ন হয়ে যাচ্ছে। যার স্বাস্থ্যের মান নিম্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে–সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মানও হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।"[৮]

---

৬. Thompson Warren.S. Population Problem, New York, 1953.pp. 19195.
৭. Huxley. Aldous, Brave New World Revisited,. 1959 page-127
৮. Huxley, Aldous,. Brave New World Revisited, 1954,page-28

হাক্সলী জনৈক জীবতত্ত্ব বিশেষজ্ঞের (ডাক্তার সিন্ডান) মতামত নিম্ন ভাষায় উদ্ধৃত করেনঃ 'বর্তমান অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর লোকদের তুলনায় নিম্ন শ্রেণীর লোক সংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়ে চলেছে। মানব বংশ বৃদ্ধির ধারণা এ ধরনের ভ্রান্তি ও বক্রগতি জীব-বিজ্ঞান মুতাবিক একটি বুনিয়াদী সত্য বৈ আর কিছু নয়।"

সিন্ডান এ কথাও বলেন যে, আমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, ১৯১৬ সালের তুলনায় সাধারণ বুদ্ধিমত্তার মান বর্তমানে অনেকনিম্ন।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিন্তাবিদ বারট্রাণ্ড রাসেল অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে (অথচ অত্যন্ত মজার ব্যাপার এই যে, রাসেল ও হাক্সলী দু'জনেই জন্মনিরোধ— বিশেষত প্রাচ্যে এর ব্যাপক প্রসারের ঘোর সমর্থক) লিখেছেনঃ

"ফ্রান্সে বর্তমানে জনসংখ্যা স্থির অবস্থায় (Stationary) আছে অর্থাৎ একই অবস্থায় রয়েছে। এবং ইংল্যাণ্ড দ্রুতগতিতে ঐ একই অবস্থায় পৌছুচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশেষ এক শ্রেণীর লোক সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং অপর বিশেষ শ্রেণী সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কাজেই অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন না হলে যা হবে তা হচ্ছে এই যে, যে শ্রেণী কমে যাচ্ছে তা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং যে শ্রেণী বেড়ে চলেছে তার দ্বারাই দেশ ভরে যাবে। যে শ্রেণীর লোক কমে যাচ্ছে তারা হচ্ছে-দক্ষ কারিগর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। যারা বেড়ে চলেছে তারা হচ্ছে গরীব, ভোতা মস্তিষ্ক, মাতাল ও নির্বোধ ধরনের লোক। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে যারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর তাদের সংখ্যা প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের বংশধরদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে উত্তম অংশ নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃত্রিম উপায়ে এতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা হয়। অন্তত যারা বৃদ্ধি পায় তাদের তুলনায় যারা কমে যায় তাদের অবস্থা ঠিক উল্লেখিত ধরনেরই হয়।"[৯]

ভবিষ্যত বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে রাসেল আরও লিখেনঃ

"ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ কিছু সংখ্যক শিশু বাছাই করে নিয়ে যদি মাতা পিতার[১০] অবস্থা পর্যালোচনা করা হয় তাহলে জানা যাবে যে, বোধশক্তি, দৈহিকশক্তি ও বুদ্ধি-জ্ঞানের আধুনিকতায় এরা সাধারণ অধিবাসীদের তুলনায় নিম্নমানের; আর নিষ্ক্রিয়তা, নির্বুদ্ধিতা, চিন্তাশক্তিহীনতা ও সংস্কার আসক্তির ব্যাপারে এরা সকলের উর্ধে। আমরা আরও জানতে পারি যে, বোধশক্তি সম্পন্ন সক্রিয় মেধাবী ও প্রগতিশীল শ্রেণী তাদের সমসংখ্যক সন্তান জন্মাতে পারছে না।

---

৯. Russel Bertrand: Principles of Social Reconstructions, 1951. Page 24.

১০. পরিসংখ্যান বিভাগের একটি বিশেষ পরিভাষা মাফিক পর্যালোচনা করে সকল গ্রুপের প্রতিনিধিত্বশীল একদল লোক বাছাই করে নেওয়াকেই Sample বা নমুনা গ্রহণ বলে।

অন্য কথায়, সাধারণত এ শ্রেণীর লোকদের গড়ে দু'টি করে সন্তান জীবিত থাকে না। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিপরীত, এদের পরিবারে দু'টির বেশী সন্তান জন্মায় এবং বংশবৃদ্ধির মারফত এরা বরাবর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে যায়।[১১]

পুনরায় এ পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে রাসেল বলেন যে, সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক সংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস প্রাপ্তির পরিণাম স্বরূপঃ

(১) ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্মান জাতির লোক-সংখ্যা অনবরত কমে যাচ্ছে।

(২) লোক-সংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন এসব জাতির উপর অপেক্ষাকৃত কম সভ্য জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং এদের উচ্চমানের রীতিনীতি খতম হয়ে যাচ্ছে।

(৩) এসব জাতির মধ্যে যাদের সংখ্যা বাড়ছে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক এবং দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

এ সম্পর্কে রাসেল বর্তমান অবস্থাকে রোমীয় সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, ঐ সভ্যতার ধ্বংসের মূলেও এ ধরনের কার্যকারণই বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেনঃ "দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ঈসায়ী শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যে কর্মক্ষম জনসমাজেও বুদ্ধিমত্তার যে অধঃগতি দেখা দেয় তা চিরকালই অবোধগম্য রয়ে গেছে। তবু আজকের দুনিয়ায় আমাদের সভ্যতায় যা কিছু ঘটছে-সে যুগেও ঠিক ঐ ধরনেরইব্যাপারই ঘটেছিল বলে বিশ্বাস করার সংগত কারণ রয়েছে। অর্থাৎ রোমীয়দের প্রত্যেক স্তরের উত্তম লোকগণ তাদের সম-সংখ্যক সন্তান জন্মাতে ব্যর্থ হয় এবং যাদের কর্মশক্তি ছিল না তারাই হয় জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ।"[১২]

এসব আলোচনার পর জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক রাসেলের মত চিন্তাবিদও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যেঃ

"এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নৈতিক মানদণ্ড পরিবর্তিত না হলে সকল সভ্য দেশে পরবর্তী দু-তিন স্তরের বংশধরদের নৈতিক মান নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছবে এবং সভ্য লোকদের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হবে। ....এ পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের জন্মহারে প্রচলিত অশুভ নির্বাচন পদ্ধতিকে[১৩] (Sefectiveness)-কোননা কোন উপায়ে বন্ধ করতে হবে।"

---

১১. Russel Betrand, Principles of Social Reconstruction. pp. 124 125

১২. রাসেলে পূর্বোলেখিত পুস্তক. ১২৬

১৩. অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বৃদ্ধিকারী পন্থা নির্বাচনের পদ্ধতি।

এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের কল্যাণে একদিকে সমাজের শ্রেণীগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং কর্মদক্ষ শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যায়—অপর দিকে সমাজে শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত বিকৃত হয়ে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও উদ্বেগজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। সমগ্র জনসংখ্যায় শিশুদের অনুপাতের তুলনায় বৃদ্ধদের অনুপাত অনেক বেড়ে যায় এবং এর ফলে স্বাভাবিক পন্থায় জাতির দেহে নয়া রক্ত সঞ্চয়ের পদ্ধতি ব্যাহত হয়। শিশুদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তির দরুন ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদাই শুধু হ্রাস পায় না; পরন্ত সমগ্র জাতির কর্মশক্তি, উদ্যম ও প্রেরণার স্থলে নিক্রিয়তা ও স্থবিরতা স্থান পায়। বিপদের মোকাবিলা করা এবং প্রয়োজনের সময় জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করার প্রেরণা খতম হয়ে যায়। এর ফলে জাতির বিপুল সংখ্যক লোক শুধু ছককাটা পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এ ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে একটি জাতিকে জ্ঞান, জীবিকা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐ সব জাতির অনেক পেছনে ফেলে দেয় যারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নতুন সন্তান জন্মায় এবং যাদের বিপুল সংখ্যক যুবক জাতির আশা-আকাংখাকে উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে যে হারে শিশু ও যুবকদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং বৃদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তার স্বাভাবিক কুফল দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই নিজের চোখে এসব দেখতে পারেন। গত ৭০ বছরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে পরের পৃষ্টায় প্রদত্ত চার্টই তার জ্বলন্ত প্রমাণঃ

এ সব দেশে জনসংখ্যার আভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে পরিবর্তন হচ্ছে, কোন দেশই এ থেকে বাদ পড়ছে না। সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যার এই ভারসাম্যহীনতার গতিধারা সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান জনিত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এবং এতে এ বিষয়ে উদ্বেগজনক তথ্য পরিবেশন করেছে।[১৪] এ রিপোর্ট পরিবেশিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ১৯০০ এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যায় ৬৫ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্কদের সংখ্যা যদি ১০০ ধরে নেয়া যায় তা হলে ১৯৫০ সালে এদের সংখ্যা নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

নিউজিল্যাণ্ড-	২৩৬
বৃটেন-	২৩১
অষ্ট্রিয়া-	২১২
আমেরিকা-	২০০
জার্মানী-	১৯০
বেলজিয়াম-	১৭৩
ফ্রান্স-	১৪৪

১৪. The Aging of Population and Its Economics Secial Implication United Nations Department of Economic and Social Afiairs, New York, 1956.

(১) জনসংখ্যার বয়সের অনুপাত

দেশ	ঈসায়ী সাল	১০ বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়ে	১০–১৯ বছর বয়স্ক	৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক	৬৪ বছরের উর্ধ্বে
ইংলণ্ড ও ওয়েলস	১৮৮০	২৫.৭%	২০.৬%	৯.৮%	৪.৬%
	১৯৫০	১৫.৫%	১২.৪%	১৬.৮%	১০.৯%
জার্মানী	১৮৮০	২৫.১%	১৯.৭%	৮.১%	৭.৯%
*	১৯৫০	১৫.৪%	১৬.৩%	++ ১৬.৪%	৯.৩%
ফ্রান্স	১৮৮১	১৮.৩%	১৭.১%	৪.৫%	৮.০%
	১৯৬৪	১৪.১%	১৫.৭%	১৬.৪%	১১.০%
আমেরিকা	১৮৮০	২৬.৭%	২১.৪%	৮.৪%	৩,৪%
	১১৫০	১৯.৫%	১৪.৪%	১৪.৩%	৮.১%

(১) অধ্যাপক থম্পসন প্রণীত "জনসংখ্যা সমস্যা"–৯৪ পৃষ্টা।

* এ সংখ্যা পশ্চিম জার্মানীর–পূর্ব জার্মানী এতে শামিল নেই।

++ এখানে অনুপাত খুব কম নয়, কারণ সম্ভবত এই যে, ঐ সময় হিটলারের পলিসী মুতাবিক সন্তান বাড়ানো হয়েছিল এবং হিটলার ছিল জন্ম নিরোধের ঘোর বিরোধী।

রিপোর্টে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, জনসংখ্যার অনুপাত পরিবর্তনে গর্ভধারণ ক্ষমতা ও জন্মহার পরিবর্তনের প্রভাব বেশী। এ ব্যাপারে জন্মহার যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে মৃত্যুহার তা পারে না।[১৫]

এ বিষয়টি (বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি) অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অর্থবোধক। অর্থাৎ পরিণত বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে এই যে, মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাবে এবং জন্মহার হ্রাস পাবে। এছাড়া যুবকদের তুলনায় বৃদ্ধ লোকের অর্থনৈতিক ও সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম উপযোগী।[১৬]

অর্থনৈতিক কাঠামো সুষ্ঠু ভিত্তিতে উন্নত করার জন্য বৃদ্ধ ও যুবকদের সংখ্যায় এক বিশেষ ভারসাম্যমূলক অনুপাত থাকা দরকার যেন সভ্যতার গাড়ীকে যারা চালিয়ে নিয়ে যাবে তাদের হাত কখনও দুর্বল না হয়ে যায়। প্রকৃতি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করে রেখেছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকৃতির আওতায় হস্তক্ষেপ করার দরুন স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। বৃদ্ধদের সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বেড়ে যায় এবং যুবকদের সংখ্যায় প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির অভাবহেতু প্রতিকূল অনুপাত সৃষ্টি হয়। এর পরিণতি হচ্ছে কর্মী লোকদের অভাব। জাতীয় শক্তির অধঃপতন এবং অর্থনৈতিক শক্তির দুর্বলতা। অতপর যুবকদের অনুপাত হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কর্মী ও জনসংখ্যার অভাব শামিল হলে একটি জাতি শাসক থেকে শাসিত এবং উন্নত ও সম্মানজনক স্থান থেকে অবনত ও অবমাননাকারীদের কখনও ক্ষমা করে না। এই বিদ্রোহের মধ্যেই এমন সব বিষয় লুক্কায়িত থাকে যা অবশেষে অপরাধের সাজাদানকারীর ভূমিকায় অবতরণ এবং অন্যদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে যথেষ্ট উপাদান সরবরাহ করে।

فَاعْتَبِرُوْا يَاأُوْلِى الْاَبْصَارُ "হে চক্ষুষ্মানেরা। শিক্ষা গ্রহণ কর।"

২. ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগের প্রসার

জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগ প্রসারের সুযোগ হয়েছে অত্যধিক। নারী জাতি খোদাভীতি ছাড়া আরও দু'টি বিষয়ের কারনে উচ্চমানের নৈতিকতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়। প্রথমটি হচ্ছে এদের জন্মগত স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অবৈধ সন্তান জন্মের ফলে মায়ের সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হবার আশংকা। প্রথম প্রতিবন্ধকটি তো আধুনিক সভ্যতার বদৌলতে বহুলাংশে দূর হয়ে গিয়েছে। নাচ-গান, আমোদ-ফূর্তি, নৈশক্লাবে ও শরাবের মজলিসে পুরুষদের সাথে অবাধে মেলা-মেশার পর লজ্জা বহাল থাকতে পারে কি করে? বাকী ছিল অবৈধ

---

১৫. উল্লেখিত পুস্তক ২২ পৃষ্ঠা।

১৬. অধ্যাপক থম্পসনের উল্লেখিত পুস্তক ৯৫ পৃষ্ঠা।

সন্তান জন্মানোর আশংকা। জন্মনিয়ন্ত্রণকে সর্বসাধারণ্যে প্রচারের ফলে এ প্রতিবন্ধক-টুকুও আর থাকলো না। এখন নর ও নারীদের ব্যভিচারে লিপ্ত হবার প্রকাশ্য সাধারণ লাইসেন্স (O.G.L) প্রবর্তিত হয়েছে। আর ব্যভিচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত রোগ বৃদ্ধিও অপরিহার্য।

ইংলণ্ডে প্রতি বছর ৮০ হাজারেরও বেশী সংখ্যক অবৈধ সন্তান জন্মায়। ডায়োসিজেন কনফারেন্সের (Diocesan Conference) রিপোর্ট মুতাবিক দেশে ১৯৪৬ সালে যেসব শিশু জন্মায় তাদের প্রত্যেক ৮টি শিশুর মধ্যে একটি অবৈধ ছিল এবং প্রতি বছর প্রায় এক লক্ষ নারী বিয়ে ব্যতিরেকেই গর্ভবতী হয়। ডাক্তার অসওয়াল্ড শোয়ারজ (Oswald Sehwarz) লিখেনঃ

"প্রতি বছর গড়ে ৮০ হাজার স্ত্রীলোক অবৈধ সন্তান জন্মায়। (অর্থাৎ গর্ভ ধারিণীদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ)। অতি সতর্কতার সঙ্গে গৃহীত হিসাব এই যে, প্রত্যেক দশজন নারীর মধ্যে একজন বিয়ে ছাড়াই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এদলে যেসব নারী স্থান পেয়েছে তাদের অবৈধ সন্তান জন্মের সময় শতকরা ৪০ জনের বয়স ২০ বছরেরও কম, শতকরা ৩০ জনের বয়স ২০ বছর এবং শতকরা ২০ জনের বয়স ২১ বছর ছিল। এ সংখ্যাতত্ত্ব অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে উপরোক্ত সংখ্যা কিছু না কিছু দুর্ঘটনার ফল। জন্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যারা দুর্ঘটনাবশত গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল এ শুধু তাদেরই সংখ্যা। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যে হারে ব্যভিচার হচ্ছে তার অতি নগণ্য সংখ্যাই এখানে পাওয়া গিয়েছে।"[১৭]

ডাক্তার শোয়ারজ প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন নারী পাপ কাজে লিপ্ত থাকে। কিন্তু সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য আরও ভয়াবহ চিত্র পেশ করে। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত চেসার রিপোর্ট (Chesser Report) টি ৬০০০ রমণীর নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছে। এতে দাবী করা হয়েছে যে, প্রতি তিনজন নারীর একজন বিয়ের পূর্বেই সতীত্ব সম্পদ হারিয়ে বসে।[১৮] ডাঃ চেসার তাঁর "সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি?" শীর্ষক গ্রন্থেও এ বিষয়টি পরিস্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[১৯]

কিনসে রিপোর্ট (Kinsey Report) থেকে আমেরিকা সম্পর্কে জানা যায় যে,

---

১৭. Sehwarz Oswald, The Psycology of Sex, Pelican Book 1951.

১৮. Chesser, Dr. Eustace. The Sexual, Marital and Family Relationship of the English Women- 1956.

১৯. Chesser, "Is Chastity Outmoded;" London 1960. Page 75.

সেখানে ব্যভিচার ও কুৎসিত রোগের এত আধিক্য যে, সমাজের ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছে। পুরুষদের শতকরা ৪৭ জন এবং নারীদের শতকরা ৫০ জন বিনা দ্বিধায় অবৈধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।[২০]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডাঃ সারোকিন নিম্নবর্ণিত সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করেন এবং অবস্থার জন্য রক্তাশ্রু বর্ষণ করেনঃ

বিয়ের পূর্বে যৌনসম্পর্ক	নারী	শতকরা	৭ থেকে ৫০ জন
	পুরুষ	"	২৭ " ৮৭ "
বিয়ের পরে অবৈধ যৌনসম্পক	নারী	"	৫ " ১৬ "
	পুরুষ	"	১০ " ৪৫ "
অবৈধ সন্তান	১৯২৭ সালে হাজার প্রতি–		২৮ জন
	১৯৪৭ সালে " " –		৩৮৭ "
গর্ভপাত প্রতি বছর			৩৩, ৩০০ থেকে ১০,০০,০০০ জন।

এ তথ্যও কম চিত্তাকর্ষক নয় যে, জন্মনিরোধ ঔষধ ও উপকরণের (Contraceptives) বিক্রয় হার আজ আসমান বরাবর উঁচু।

এরপর সারোকিন বলেনঃ

"এ বলগাহীন যৌন উচ্ছৃংখলতার পরিণামে ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র জাতি যে কী ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে তা প্রকাশ করা আমি দরকার মনে করি না। এর নাম যৌন আজাদী অথবা যৌন স্বৈরাচার যা–ই বলুন না কেন —এ বাস্তব সত্য তো পরিবর্তিত হতে পারে না যে, এ অবস্থায় এমন সুদূর প্রসারী প্রতিফল দেখা দেবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যাবে না।"[২১]

কিন্‌সের অনুমান মুতাবিক আমেরিকায় অবৈধ সন্তানের অনুপাত ৫ জনে ১ জন। কুমারী মেয়েদের সন্তান সংখ্যা শতকরা ৪ জন। এছাড়া গর্ভপাত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব হচ্ছে এই যে, প্রতি ৪টির মধ্যে একটি গর্ভ নষ্ট করে দেয়া হয়। বরং টাইম পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৪৫ সালে ১৬,৪০০ শিশু জন্মায় এবং ১৮,০০০ গর্ভপাত করে নষ্ট করে দেয়া হয়।[২২]

---

২০. Sexual Behaviour in Human Male. Page-552

২১. Sorkin Pitirm A, The American Sex Revolution, Boston, 1956. Page 13-14.

২২. Social Problems. P. P. 418-19

এভাবে অপরাধ প্রবণতা বিশেষত যৌন অপরাধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, দিন দিন তা কেবল বেড়েই চলেছে। ইংলন্ডের যেসব দণ্ডনীয় অপরাধ পুলিশের গোচরীভূত হয়েছে তা নিম্নহারে বেড়ে চলেছেঃ[২৩]

১৯৩৮ সালে	–	–	২,৮৩,০০০
১৯৫৫ সালে	–	–	৪,৩৮,০০০

উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই যৌন অপরাধের সংখ্যা সমগ্র অপরাধের সংখ্যার শতকরা ১.৭ থেকে শতকরা ৬.৩–এ পৌছেছে।

আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন (F.B.I.)–এর সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৭–৩৯–এর তুলনায় ১৯৫৫ সালে ব্যভিচার শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য অপরাধের সংখ্যাও শতকরা ৫ থেকে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৪]

যদি সকল ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলো হিসাব করা হয়, তাহলে জানা যায় যে, ১৯৫৮ সালে ২৩ লাখেরও বেশী সংখ্যক অপরাধ পুলিশের গোচরীভূত হয়েছে। অথচ ১৯৪০ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লাখ।[২৫] কিশোরদের বখাটেপনাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমেরিকার ১৪৭৩ টি শহরে ১৯৫৭ সালে যে ২০ লাখ ৯৮ হাজার লোককে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার করা হয় তন্মধ্যে ২ লাখ ৫৩ হাজার অপরাধীর বয়স ছিল ১৮ বছরের নিম্নে।

যৌন আজাদী সৃষ্ট রোগগুলি উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা সত্ত্বেও ঐ রোগগুলি স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে।

যদি কেবল সিফিলিস্ রোগকে ধরা হয় তাহলে আমেরিকার পাবলিক হেল্থ সার্ভিসের সার্জেন জেনারেল মিঃ থমাস প্যারানোর উক্তি অনুসারে এ অবাঞ্ছিত রোগ শিশুদের পক্ষাঘাত রোগের তুলনায় শতগুণ বেশী ধ্বংসাত্মক এবং বর্তমানে এ রোগ আমেরিকার যক্ষা, ক্যান্সার এবং নিউমোনিয়া রোগের সমান ক্ষতিকর। প্রত্যেক চারটি মৃত্যুর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সিফিলিসের দরুন হয়ে থাকে।

---

২৩. A Survey of Social Conditions in England and Wales, Oxford, 1258 Page 266
২৪. Social Problem, Page 386.
২৫. Blaich and Baumgartner. The Challenge of Democracy, New York, 4th Editoin. P. 510.

অধ্যাপক পললিস্তেস্ ডাঃ প্যারানোর উক্তির উদ্ধৃতি সহকারে আমাদের জানাচ্ছেনঃ

"নতুন ধরনের ঔষধের উন্নতি ও ব্যবহারের ফলে ১৯৪৭ সাল থেকে এ অবাঞ্ছিত রোগ কমে যাচ্ছিল, কিন্তু ১৯৫৫ সালে হঠাৎ গতি ফিরে যায়। আমেরিকার বড় বড় শহরে সিফিলিস এবং গনোরিয়া রোগ দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে এবং কুড়ি বছরের নিম্ন কিশোরদলই এবার এ রোগে বেশী করে আক্রান্ত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মোট রোগীদের শতকরা ৫০ ভাগ যুবকদের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে।"[২৬]

১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসের 'রিডার্স ডাইজেষ্টে, জর্জ কেন্ট এবং উইলফ্রে গোটোরেসের একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়। ওতে লেখকদ্বয় বলেন যে, বৃটেনের বড় বড় শহর তথা লন্ডন, বার্মিংহাম ও লিভারপুলে এ অবাঞ্ছিত রোগ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলছে। রোগজীবাণু ধ্বংসকারী নতুন ঔষধ-পত্রের বদৌলতে এসব রোগ কিছুকাল চাপা ছিল, কিন্তু অবশেষে সাফল্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ৪ বছর সময়ের মধ্যে এ অবাঞ্ছিত রোগ শতকরা ২০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫৯ সালে গণোরিয়া রোগে যারা নতুন আক্রান্ত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল একত্রিশ হাজার। অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি। আর এ সংখ্যার মধ্যে শুধু তাদেরকেই ধরা হয়েছে যারা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এসেছে। যারা সাধারণ পেশাদার চিকিৎসক এবং প্রাইভেট বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা করায় অথবা যারা মোটেই চিকিৎসা করায় না তারা উপরোক্ত হিসাবের মধ্যে নেই। লেখকদ্বয় এ-ও বলেন যে, ১৯৪৮ সাল থেকে এ যাবত রোগের গতি প্রকৃতির সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যায় যে, এক বছরে ১৮-১৯ বছর বয়স্ক যুবকদের মধ্যে গণোরিয়া শতকরা ৩৬ ভাগ এবং যুবতীদের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। বৃটেনের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ডালজেল ওয়ার্ড (Dalzell Ward)-এর অনুমান এই যে, ২০ বছরের নিম্ন বয়স্কদের মধ্যে এ অবাঞ্ছিত রোগ বর্তমানে যে পরিমাণে বেড়ে চলেছে ইতিপূর্বে কখনও এমনভাবে বাড়তে দেখা যায়নি। লণ্ডনের একটি মাত্র হাসপাতালেই এই সময়ে উক্ত রোগের ৪৯০ জন রোগী বর্তমান ছিল। লিভারপুলের এ অবাঞ্ছিত রোগীদের অর্ধেক সংখ্যক ছিল ১৭ বছর থেকে ২১ বছরের মধ্যবর্তী বয়স্ক।

অন্যান্য দেশেরও অল্প বিস্তর একই অবস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য-সংস্থার (World Health Organisation or WHO) এক সাম্প্রতিক সম্মেলনে ১৬ টি দেশের পক্ষ থেকে পেশকৃত রিপোর্টে বলা হয় যে, ও-সব দেশে সিফিলিস ও গনোরিয়া ভয়ংকর

---

২৬. Social Problems- Page 313

মহামারীরূপে বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের মধ্যে সিফিলিস রোগীর সংখ্যা ইটালীতে তিনগুণ এবং ডেনমার্কে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এ অবস্থা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আধুনিক দুনিয়ায় পাপের যেসব দরজা খুলে দিয়েছে তার মধ্য দিয়ে ব্যভিচার, যৌন অপরাধ এবং অবাঞ্ছিত রোগের বাহিনী নর্তন-কুর্দন করে প্রবেশ করেছে এবং সমগ্র সমাজকে ধ্বংসের কবলে টেনে নিয়ে চলেছে।

৩. তালাকের আধিক্য

যেসব কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে দাম্পত্য জীবনের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছে তার মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ অন্যতম। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধনকে মজবুত করার ব্যাপারে সন্তানের ভূমিকা খুবই প্রভাবশীল। সন্তানের অবর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর একের পক্ষে অপরকে ত্যাগ করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। এ কারণেও ইউরোপে তালাকের ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। আর বিয়ে ভঙ্গকারীদের মধ্যে সন্তানহীনদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। কিছু দিন পূর্বে লন্ডনের এক আদালতে মাত্র দেড় মিনিট সময়ের মধ্যে ১১৫ টি বিয়ে বাতিল ঘোষণা করা হয় এবং ১১৫ টি দম্পতির সব কয়টিই নিঃসন্তান ছিল।

সমাজ-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সন্তানের অভাব বিয়ে বাতিল করার ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশীল বিষয়। এ ব্যাপারে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একমত। টালকোট পারসন্‌স (Talcott Parsons) স্পষ্ট হিসাব প্রদান করার পর বলেনঃ

> "বেশীর ভাগ তালাকই বিয়ের প্রথম বছরে এবং সন্তানহীন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঘটে থাকে এবং ঘটছে। এ বিয়ের পূর্বে এদের জীবনে বিয়ে এবং বিচ্ছেদ ঘটে থাকলেও ঐ একই অবস্থা এর মূলে কাজ করেছে। একবার সন্তানের জন্ম শুরু হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বসবাস করার সম্ভাবনা অনেক বেশী হয়ে যায়।"[২৭]

অনুরূপভাবেই বার্ণস এবং রুয়েদী (Barnes and Ruedi) নিজেদের অনুসন্ধানের বিবরণ নিম্ন ভাষায় ব্যক্ত করেনঃ

"বিয়ে বাতিলকারীদের দুই তৃতীয়াংশ নিঃসন্তান এবং মাত্র এক পঞ্চমাংশ এক

---

২৭. Parsons. Talcott. The Stability of American Family System, Bell and Vogel (Ed). A Modern Introduction of the Family, London 1961. Page 94.

সন্তানের পিতা মাতা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তালাক ও সন্তানহীন দম্পতির মধ্যে একটি পরিষ্কার সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।"[২৮]

বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'সাইকোলোজিষ্ট–এর জুন, ১৯৬১–এর সংখ্যায় এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, সাধারণত সকল দম্পতির জন্যে সন্তানের মাতা–পিতা হওয়া জরুরী। যারা সন্তানের জন্মকে বিলম্বিত করে তাদের তজ্জন্য পরে আফসোস্ করতে হয়। সন্তানহীন দাম্পত্য জীবন নিত্য নতুন সমস্যার জন্ম দেয় এবং সাময়িকভাবে স্বামী–স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। এর পরিণতি স্বরূপ দাম্পত্য জীবনে এমন একটা উদ্যমহীনতা এসে যায় যে, তা দেখে মনে হয় পথিক তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ আমাদের বার বার সতর্ক করে বলেছেন যে, সন্তানহীন পরিবারে তালাকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। সন্তানহীন অবস্থায় (সন্তানের মাতা বা পিতা হওয়ার) গোপন বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। স্ত্রীদের ব্যাপারে তো এ বিষয়টা আরও জটিল হয়ে ওঠে। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার জন্মগত সন্তান বাৎসল্যকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। ফলে তার দৈহিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং তার জীবনের সকল আনন্দ ও উৎসাহ হিম–শীতল হয়ে পড়ে'।[২৯]

ডাঃ ফ্রিড্‌ম্যান ও তাঁর সঙ্গীদের অনুসন্ধানের ফলও অনুরূপ। তিনি তাঁর নিজের এবং অন্যান্য সঙ্গীদের গবেষণার ফলাফল নিম্ন ভাষায় ব্যক্ত করেনঃ

"তালাকের হার সেসব পরিবারের মধ্যেই বেশী যেগুলো বিয়ের পর সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকে অথবা যেসব পরিবারে সন্তানের সংখ্যা কম"।[৩০]

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনকারী দেশগুলোতে দিন দিন তালাকের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ডাঃ অসওয়াল্ড শোয়ারজ ইংল্যান্ড সম্পর্কে লিখেনঃ

"গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে হারে তালাকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে মহামারীর মত দ্রুতগতি ও ধ্বংসলীলার আভাস পরিলক্ষিত হয়। এদেশে ১৯১৪ সালে সর্বমোট ৮৫৬ টি তালাক সম্পাদিত হয়েছিল। এ সংখ্যা ১৯২১ সালে ৩৫২২, ১৯২৮ সালে ৪০০০ এবং ১৯৪৩ সালে ৩৫,৮৭৪ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

---

২৮. Barnes. H. F. and Ruedi. O. M.; The American Way of Life, New York. 1951. Page 652.

২৯. Alexander, James N. The Psychologist Magazine, London ,June. 1961. P. 5.

৩০. Freedman, Whelpton and Campbell., Family Planning, Sterility and Population Growth, New York. 1959, Page 45.

তবু কি বিপদ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না যে, আমাদের তাহজীব নৈতিক অধপতনের চরম সীমায় পৌছে গেছে"?[৩১]

ইংলন্ডের পারিবারিক আদালতের সংখ্যাতত্ত্ব অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, সেখানে তালাকের মোকদ্দমার ডিক্রী নিম্ন হারে বেড়ে চলেছেঃ

১৯৩৬	সালে	–	৪০৫৭
১৯৩৯	"	–	৭৯৫৫
১৯৪৭	"	–	৬০৭৫৪

এরপরে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তালাকের হার কিছুটা কমে যেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫২ সালে পুনরায় এ হার বাড়তে থাকে এবং এরপর থেকে বরাবর তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই চলেছে।

আমেরিকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, ১৮৯০ সালে সে দেশে স্বামী স্ত্রীর কোন একজনের মৃত্যুর দরুন যদি দশটি দম্পতির সম্পর্কচ্ছেদ হতো তবে তালাকের দরুন হতো একটির। কিন্তু ১৯৪৯ সালে এর অনুপাত ১০:১ থেকে ১.৫৮:১–এ এসে দাঁড়ায়। বিয়ে এবং তালাকের অনুপাতও বরাবর ভারসাম্য হারিয়ে চলেছে। নিম্নের বর্ণিত সংখ্যা থেকে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হবেঃ

সাল	–	বিয়ে	–	তালাক
১৮৭০	–	৩৩.৭	–	১
১৯১৫	–	১০.১২	–	১
১৯৪০	–	৬	–	১
১৯৪২	–	৫	–	১
১৯৪৪	–	৪	–	১
১৯৪৫	–	৩	–	১
১৯৫০	–	৪.৩	–	১
১৯৫৮	–	৩.৭	–	১

এর অর্থ হলো এই যে, ১৮৭০ সালে প্রায় ৩৪ টি বিয়ে হলে একটি তালাক

৩১. Sehwarz; The Philosophy of Sex, P. 243.

হতো। কিন্তু এখন প্রতি চারটি বিয়েতে একটি তালাক হয়ে থাকে। ১৮৯০ সালে ১০০০ নারীর মধ্যে মাত্র তিনজন হতো তালাক প্রাপ্তা। কিন্তু ১৯৪৬ সালে এ সংখ্যা ১৭.৮ এ পৌছে। বুঝা গেল তালাক প্রাপ্তা নারীর সংখ্যা প্রায় ৬ গুণ বেড়ে গিয়েছে। এ জন্যই অধ্যাপক সারোকিন বলেছেন যে, বিয়ের পবিত্রতা সম্পর্কিত ধারণা পূর্বের তুলনায় এখন দ্রুতগতিতে এবং তীব্রভাবে পালটিয়ে যাচ্ছে এবং গৃহ একটি স্থায়ী বাসস্থান হওয়ার পরিবর্তে গ্যারেজে পরিণত হতে চলেছে। এটাকে রাত্রিযাপনের স্থান মাত্র বিবেচনা করা হয়, যদিও সম্পূর্ণ রাত্রি এতে থাকা জরুরী নয়।

তালাকের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবার (Desertion) প্রবর্তনও দিন দিন বেড়ে চলছে এবং আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে ওটা গরীবের তালাক (Poor-Man's Divorce) নামে পরিচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমেরিকায় দশ লক্ষেরও বেশী পরিবার এ অবস্থায় আছে। আদমশুমারীর হিসেব মুতাবিক আমেরিকায় দশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রী এবং পনর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন স্বামী রয়েছে।[৩২] সারোকিনের অনুমান এই যে, আমেরিকার মোট বিবাহিত নারীদের শতকরা চারজন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে এবং সরকারী তহবিল থেকে এসব পরিবারের জন্যে বার্ষিক প্রায় ২৫ কোটি ডলার খরচ হচ্ছে।[৩৩] তালাক, বিচ্ছিন্ন জীবন–যাপন এবং স্বামী–স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতার দরুন আমেরিকার মোট ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশুর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ (শতকরা ২৫ ভাগের কিছু বেশী) শিশু আজ মাতা–পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত। আর এসব ছেলে–মেয়েদের দরুনই আমেরিকায় দিন দিন কিশোরদের উচ্ছৃংখলতা বেড়ে গিয়ে দেশের জন্যে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. জন্মের হার কমে গেছে

এর পরিণতি স্বরূপ বর্তমানে যতগুলো জাতি জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছে তাদের জন্মহার ভীষণভাবে কমে গেছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৭৬ সাল থেকে এ আন্দোলনের প্রচার শুরু হয়েছে। পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে বিভিন্ন দেশে প্রতি হাজারে জন্মহার কি ছিল এবং পরে কিভাবে কমে চলেছে তা জানা যাবে।

এ সংখ্যাতত্ত্ব জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে। এ আন্দোলনের শুরু থেকে বিভিন্ন দেশে বিনা ব্যতিক্রমে জন্মহারের হ্রাস প্রাপ্তি এবং এর গতি অব্যাহত থাকা থেকে একবার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ এর

---

৩২. Bergel, Egon Ernest, Urban Sociology, New York, 1955, p 298 n.
৩৩. এ হিসাব ১৯৫৩ সালের আমেরিকার যৌন–বিপ্লব থেকে গৃহীত, ৮ পৃঃ।

একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ নিশ্চয়ই। ইংল্যান্ডের রেজিষ্ট্রার জেনারেল নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন যে, জন্মহার হ্রাস প্রাপ্তির শতকরা ৭০ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণের দরুন ঘটে থাকে। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য দেশ সমূহের জন্মহার হ্রাস প্রাপ্তির কারণগুলোর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপকরণাদির প্রভাব অত্যধিক।

রয়েল কমিশন অব পপুলেশনের ১৯৪৯ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯১০ সালের পূর্বে যারা বিয়ে করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৬ জন জন্মনিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু ১৯৪০-৪২ এর পর থেকে শতকরা ৭৪ টি দম্পতি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ প্রসংগে রয়েল কমিশন পরিষ্কার বলেছেন যেঃ

"এদেশে এবং আরও অন্যান্য দেশে এরূপ স্পষ্ট নিদর্শন বর্তমান আছে যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবারকে সীমিত করার প্রবণতার দরুনই জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে। এ পদ্ধতি চালু করার পূর্বে জন্মহার যেভাবে হ্রাস পাচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী হ্রাস পেয়েছে এর উপকরণাদি ব্যবহার করার দরুন।"[৩৪]

আমেরিকার হোয়েল্‌পটন ও কাইজার (Whelpton and Kiser)-এর গবেষণামূলক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, সে দেশে শতকরা ৯১.৫টি দম্পতি কোন না কোন উপায়ে জন্মরোধ করে থাকে।[৩৫] ফিডম্যান এবং তার সঙ্গীদের গবেষণা থেকে প্রকাশ; সমষ্টিগতভাবে আমেরিকার শতকরা ৭০টি পরিবার জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে।[৩৬] এ লেখকগণ বৃটেন ও আমেরিকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পর আমাদের জানানঃ

"এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পরিবারগুলোর ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্তির মূলে রয়েছে গর্ভনিরোধের প্রচেষ্টা।"

জন্মনিরোধের ফলাফল সম্পর্কে এর চেয়েও সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে এসব দেশের বিয়ে ও জন্মের হার তুলনা করে দেখুন। ইংলন্ডে ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত সময়ে বিয়ের হার কমেছে শতকরা ৩.৬ কিন্তু ঐ সময়ে জন্মহার কমেছে

---

৩৪. Report of the Royal Commission on Population H. M. S. O. London. 1949, P. 34.

৩৫. The Planning of Fertility Milbank Memorial Fund Quarterly (1947) PP.66-67.

৩৬. Family Planning, Sterility and Population Growth, New York. 1959, Page 5.

জন্মহার

দেশের নাম	১৮৭৬	১৯০১	১৯১৩	১৯২৬	১৯৩০–৩৪	১৯৩৫–৩৯	১৯৪০–৪৪	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৭	১৯৫৮
ইংলন্ড ও ওয়েলস–	৩৬.৩	২৮.৫	২৩.১	১৭.৮	১৫.৮	১৫.৩	১৬.০	১৫.৯	১৫.৫	১৫.৫	১৬.৫	১৬.৮
ফ্রান্স	২৬.২	২২.০	১৯.০	১৮.৮	১৭.৩	১৫.১	১৬.৩	১৮.৯	১৮.৯	১৮.৬	১৮.৬	১৮.২
জার্মানী	৪০.৯	৩৫.৭	২৭.৫	২০.৭	১৬.৬	১৯.৯	–	১৫.৮	১৬.১	১৬.০	১৭.০	১৭.০
ইটালী	৩৯.২	৩২.৬	৩১.৭	২৭.৮	২৪.৫	২৩.২	২০.৮	১৭.৭	১৮.২	১৮.১	১৮.১	১৭.৯
বেলজিয়াম	৩৩.২	২৯.৪	২২.৬	১৮.৯	১৭.৬	১৫.৫	১৩.৮	১৬.৬	১৬.৮	১৬.৮	১৭.০	১৭.১
ডেনমার্ক	৩২.৬	২৯.৭	২৫.৬	২১.০	১৭.৯	১৭.৯	২০.৩	১৭.৯	১৭.৩	১৭.৩	১৬.৮	১৬.৬
হল্যাণ্ড	৩৭.১	৩২.৩	২৮.৩	২৩.৮	২১.৭	২০.৩	২১.৮	২১.৮	২১.৬	২১.৪	২১.২	২১.১
সুইডেন	৩০.৮	২৭.০	২৩.১	১৬.৯	১৪.৪	৪.৫	১৭.৭	১৫.৪	১৪.৬	১৪.৮	১৪.৫	১৪.২
সুইজারল্যাণ্ড	৩৩.০	২৯.০	২৩.১	১৮.২	১৬.৭	১৫.৪	১৭.৯	১৭.০	১৭.০	১৭.১	১৭.৭	১৭.৬

বিঃ দ্রঃ–১৯২৬ সালের পরবর্তী সংখ্যাতত্ত্ব U.N. Demographic Year Book for 1959 থেকে গৃহীত।

শতকরা ২১.৫। পুনরায় ১৯০১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত বিয়ের হার অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু ঐ সময়ে জন্মহার হ্রাস পায় শতকরা ১৬.৫। নিম্নের চার্টে ১৯১২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত সময়ের বিয়ে ও জন্মহার অনুপাত দেখানো হলোঃ

দেশ	বিয়ের হার			জন্মহার		
ফ্রান্স	শতকরা	৭.৬	বৃদ্ধি	শতকরা	২৮.২	হ্রাস
জার্মানী	"	৯.৪	হ্রাস	"	৪৯.৪	"
ইটালী	"	৯.৮	"	"	২৯.১	"
হল্যাণ্ড	"	১০.২	"	"	৩৫.০	"
সুইডেন	"	১১.৩	"	"	৪৫.১	"
ডেনমার্ক	"	১২.৩	"	"	৩৫.৬	"
সুইজারল্যাণ্ড	"	১২.৯	"	"	৪৪.৮	"
ইংল্যান্ড ও ওয়েল্স	"	১৩.৩	"	"	৫১.০	"
নরওয়ে	"	২৬.০	"	"	৩৮.০	"

আমেরিকাও এ পথেরই যাত্রী। সে দেশে উনিশ শতকের শেষাংশে জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ ছিল। ১৯৩৫ সালে তাদের জন্মহার মাত্র হাজার প্রতি ১৮.৭–এ এসে দাঁড়ায় এবং বর্তমানে সেখানে জন্মহার হচ্ছে প্রতি হাজারে ২৩.৬[৩৭] অপরদিকে বিয়ের হার ১৯০১ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৯.৩ এবং ১৯৩৫ সালে এর সংখ্যা হাজার প্রতি ১০.৪–এ পৌছে। ১৯৫৬ সালে সে দেশের বিয়ের হার দাঁড়ায় হাজার প্রতি ৯.৪। এ হিসাব থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণকারী নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক কিরূপ অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। যে পরিমাণে বিয়ের হার কমে আসছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে জন্মহার কমে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ের হার বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জন্মহার কমে চলেছে। সম্প্রতি বৃটেনের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছেঃ

"বিশ শতকে বিয়ের হার বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জন্মহার কমেছে। এ সময়ে শুধু যে বিয়ের হার বেড়েছে তাই নয়–বিয়ের বয়সও অনেকটা কমেছে।"[৩৮]

৩৭. Popualation and Vital Statistics, U.N.O. Aprial, 1961.
৩৮. Britain, An official Hand Book. 1954 P. 8.

জন্মনিরোধের এক ফল হচ্ছে এই যে, পরিবারের সদস্য সংখ্যার গড় ক্রমেই কমে আসছে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোতে পরিবার আকারে ছোট হয়ে চলেছে। এখন তো ঐ সব পরিবারের সংখ্যা বেশী যাদের কোন সন্তান নেই অথবা মাত্র একটি কিংবা দুইটি সন্তান আছে। এ বিষয়েও জন্মনিরোধ আন্দোলনের আগের ও পরের সংখ্যাতত্ত্বে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ইংলন্ডে ১৮৬০ ও ১৯২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যেসব বিয়ে হয়েছিল তাদের সন্তান সংখ্যার হিসাব নিম্নরূপঃ–

পরিবারের সংখ্যা

১৮৬০ সালে	১৯২৫ সালে	সন্তানের সংখ্যা
শতকরা ৯	শতকরা ১৭	নিঃসন্তান
" ১১	" ৫০	১টি কিংবা দু'টি সন্তান
" ১৭	" ২২	৩টি কিংবা ৪টি "
" ৪৭	" ১১	৫টি থেকে ৯টি "
" ১৬	–	১০টি কিংবা তার চেয়ে বেশী

এর ফল হচ্ছে এই যে, পরিবারের জনসংখ্যার গড় কমে আসছে এবং সে জন্যে পরিবার ক্রমেই ছোট হয়ে চলেছে। ১৮৭০–৭৯ সালে বিবাহিতা নারীদের সন্তান জন্মদানের গড় সংখ্যা ছিল জনপ্রতি ৫.৮। এই সংখ্যা ১৯২৫ সালে মাত্র ২.২–এ এসে দাঁড়ায়। বর্তমান এ সংখ্যা ২.২ এর সামান্য উর্ধে।[৩৯]

১৯১০ সালে আমেরিকার জনপ্রতি গড়ে ৪.৭টি সন্তানের জন্ম হতো—এ সংখ্যা ১৯৫৫ সালে মাত্র ২.৪–এ পৌছেছে। ১৯১০ সালে আমেরিকার সর্বমোট বিবাহিত নারীদের মধ্যে শতকরা দশজন ছিল সন্তানহীনা এবং শতকরা ২২ জন ছিল এক বা দু'সন্তানের মা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে মোট বিবাহিতা নারীদের শতকরা ১৬ জনকে সন্তানহীন এবং শতকরা ৪৭ জনকে এক বা দু'সন্তানের মা হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। অপর দিকে ১৯১০ সালে সর্বমোট বিবাহিতা নারীদের মধ্যে শতকরা ২৯ জন ছিল সাত বা ততোধিক সন্তানের জননী। কিন্তু ১৯৫৫ সালে এ সংখ্যা শতকরা মাত্র ৬–এ এসে দাঁড়িয়েছে।[৪০]

৩৯. Britain An Official Hand Book, Central Office of Information, London, 1961, Page 12.

৪০. Freedman and other's Family Planning Sterility and Population Growth.P. 5

জন্মহার দিন দিন এভাবে কমে যাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন দেশের জনসংখ্যাতে কিছু বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, তার কারণ হ'লো চিকিৎসাবিদ্যা ও ব্যাপক স্বাস্থ্যরক্ষা পদ্ধতির উন্নতির দরুন মৃত্যুহারের হ্রাস প্রাপ্তি। কিন্তু এখন জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে আর বিশেষ পার্থক্য নেই। এজন্যেই আশংকা করা যাচ্ছে যে, শীঘ্রই জন্মহার মৃত্যুহার থেকে কমে যাবে। এর মানে হলো ওসব জাতির যত সংখ্যক সন্তান জন্মাবে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক মরে যাবে।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও অষ্ট্রীয়ার জনসংখ্যা কিছুকাল পর পরই বেড়ে যাবার পরিবর্তে কমে যায়। এসব দেশে তাদের সাবেক অবস্থাও বহাল রাখতে পারে না। ইংল্যান্ডের জনসংখ্যাও প্রায় অনড় অবস্থায়ই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকাও এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। অষ্ট্রীয়ায় ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুর হার জন্মহারের চেয়ে বেশী ছিল। ফ্রান্সেও ১৯৩৫ ও ১৯৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুহার জন্মহারের উর্ধে ছিল। যদি এ সময় অন্য দেশের লোক হিজরত করে এসে ফ্রান্সে বসবাস করা শুরু না করতো তাহলে এদেশের জনসংখ্যা ভীষণভাবে কমে যেতো। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪-৩৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে ফ্রান্সের মূল অধিবাসীদের সংখ্যা কমে যায়।[৪১]

আমেরিকার শহরের অধিবাসীদের হিসেব নিয়ে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তারা নিজেদের সমান সংখ্যক সন্তানও জন্মাতে পারেনি। এ সময়ে যে জন্মহার ছিল, তা থেকে অনুমান করা হয়েছিল যে, অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এক পুরুষ পরেই সে দেশের জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ কমে যাবে।

ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা কমিশনের ১৯৪৯ সালের রিপোর্ট মুতাবেক ১৯৪৫ সালের শেষে সে দেশের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, যারা দৈহিক পরিশ্রম করে না সে সব উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যে বিয়ের পর ষোল থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত সময়ে জন্মহার ছিল পরিবার প্রতি ১.৬৮। এ অবস্থা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, উল্লেখিত শ্রেণীর লোক ধীরে ধীরে নির্বংশ হতে চলেছে। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যেঃ

"যে জনপদে মাত্র দুটি সন্তানের মাতা-পিতা হবার প্রথা চালু হয়ে যায়। কিংবা যেখানে বিবাহিত নারী-পুরুষের শেষ পর্যন্ত মাত্র দুটি সন্তান জীবিত থাকে সে

Demograghic Year Book, 148, U.N.O. Edition. 1949.

জনপদ উজাড় হয়ে যাবার পথে এবং প্রত্যেক ত্রিশ বছর পর তার জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় কমে যাবে।"

কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে এক হাজার জনসংখ্যাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে নিলে উল্লেখিত হিসাব অনুসারে ত্রিশ বছর পর তাদের সংখ্যা ৬৩১, ষাট বছর পর ৩৮৬ এবং দেড়শো বছর পর মাত্র ৯২-এ এসে দাঁড়াবে।[৪২]

অর্থনীতি বিশারদগণ জনসংখ্যার সঠিক গতি সম্পর্কে মতবাদ গঠন করার জন্যে শুধু জন্মহারের উপরই নির্ভর করেন না বরং তাঁরা জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপায়-উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতহার (Net Reproduction Rate) নির্ণয় করে ফেলেন। যদি এ হার ১ হয় তাহলে বুঝা যাবে জনসংখ্যা বাড়ছেও না কমছেও না। একের বেশী হলে বুঝা যাবে সংখ্যা বৃদ্ধির পথে এবং একের কম হলে বুঝতে হবে যে, জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্তির দিকে। কয়েকটি বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক চিত্র আমরা নীচে উল্লেখ করছি। এর সাহায্যে সে সকল দেশগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সহজ হবে।

ইংল্যান্ড	–	–	১৯৩৩ সাল		–	–	০'৭৪৭
"	–	–	১৯৩৭	"	–	–	০'৭৮৫
"	–	–	১৯৪০	"	–	–	০'৭৭২
"	–	–	১৯৪৯	"	–	–	০'৯০৯
বেলজিয়াম	–	–	১৯৩৯	"	–	–	০'৮৫৯
"	–	–	১৯৪৭	"	–	–	১'০০২
ফ্রান্স	–	–	১৯৩০	"	–	–	০'৯৩০
"	–	–	১৯৩৫	"	–	–	০'৮৭০
"	–	–	১৯৪০	"	–	–	০'৮২০
"	–	–	১৯৫৪	"	–	–	০'৯৪০
নরওয়ে	–	–	১৯৩৫	"	–	–	০'৭৪৬
"	–	–	১৯৪০	"	–	–	০'৮৫৮
"	–	–	১৯৪৫	"	–	–	১'০৭৫ [৪৩]

৪২. Dr. Frederic Burghoerier quoted by Jacques, Lecharque, Marriage and Family, New York, 1949 Page-239.

৩. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৫৫, ১৮শ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্যে এ অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলাফল দেখে সমাজের যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রকাশ্যতঃ জন্মনিরোধের সমর্থক তারাও ভয় পেয়ে গিয়েছেন। এরা নিজেদের হাতে রোপন করা গাছের ফল দেখতে পেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন এবং অন্তত নিজ নিজ দেশে জন্মনিরোধের পলিসী পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জনৈক সমাজ বিজ্ঞানীর মতামত উধৃত করা যেতে পারেঃ

"যদি ম্যালথাস আজ জীবিত থাকতেন তাহলে এটা নিশ্চয়ই অনুভব করতেন যে, পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা জন্মনিরোধ করার ব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে। বরং সত্য কথা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের তাহজীবের ভবিষ্যত নির্ধারণে সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দান করেছে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামে তো প্রকৃতপক্ষেই কিছুকাল পর পর জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে; কারণ সে সব দেশে মৃত্যুহার জন্মহারের চেয়ে বেশী; উপরন্তু পাশ্চাত্যের শিল্প ও নগর ভিত্তিক সভ্যতার দরুন অন্যান্য জাতিরাও বিপদের সম্মুখীন। আমেরিকার জনৈক জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ আমেরিকার জন্ম ও মৃত্যুর গতিধারা পর্যালোচনা করে এ কথা বলে দিয়েছিলেন যে, এক পুরুষের মধ্যেই জন্মসংখ্যা হ্রাস একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।"[৪৪]

অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কেও একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য শুনুন

"যদি আমরা জনসংখ্যা হ্রাস করার মত নির্বুদ্ধিতা করি তাহলে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, জনসংখ্যা হ্রাস বেকার সমস্যার সমাধান নয় এবং জীবিত লোকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতেও সক্ষম নয়। এর অর্থ নৈতিক প্রভাব সুনিশ্চিতভাবেই অবাঞ্ছিতরূপ ধারণ করবে। এর কারণ এই যে, এ ব্যবস্থার ফলে সমাজে বুড়োদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং উৎপাদনকারী দল কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণের বয়সেও লোকদের চাকুরীতে বহাল রাখতে বাধ্য হবে। আর যদি উৎপাদনকারীদেরও বেশীর ভাগ বুড়ো লোকই হয় তাহলে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনশীল অবস্থার সংগে সংগতি রক্ষা করার ও নিত্যনূতন পদ্ধতি অবলম্বন করার অবকাশ মোটেই থাকবে না। জনসংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারটিকে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা উচিত।"[৪৫]

---

৪৪. Landis, Paul,H; Socil Problems, PP, 596-97.

৪৫. Cole, G.D.H. The Intelligent Man's Guide to the Post-War World, London. 1948. PP. 445-46.

অপর একজন ঐতিহাসিকের চিন্তাধারাও খুবই শিক্ষণীয়

"অপর যে পদ্ধতি দ্বারা একটি উন্নত ও বিত্তশালী জাতির আয়ু ক্ষয় হয়ে থাকে, তা হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা হ্রাস। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যেসব জাতি বিলাসিতা ও যৌন উশৃংখলতায় মগ্ন হয়ে যায় তারা বংশ-বৃদ্ধির দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয় এবং সন্তান তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃংখলতার পথে অন্তরায় বিবেচিত হয়। এ ধরনের যৌন লিপ্সার পূজারীদল গর্ভনিরোধ উপকরণাদি ব্যবহার, গর্ভপাতের এবং এ ধরনেরই অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সকলকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এর ফলে উক্ত জাতি প্রথমে স্থির ও হ্রাস-বৃদ্ধিহীন হয়ে যায় এবং কিছুকাল পর এর জনসংখ্যা কম হতে শুরু করে। এমনকি উক্ত জাতি ক্রমে এমন স্তরে গিয়ে পৌছে যে, নিজেদের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করার মত শক্তিও তার মধ্যে থাকে না। অর্থাৎ এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যও টিকিয়ে রাখতে পারে না এবং প্রাকৃতিক ও মানব জাতির দুশমনদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। এ অবস্থা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার শামিল। উশৃংখলতা ও চরিত্রহীনতার স্বাভাবিক পরিণতিতে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়, তা এ আত্মহত্যার পথকে আরও প্রশস্ত করে দেয়। আর এ উভয় অবস্থার ফলে জাতির আয়ু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। এ ধরনের জাতীয় আত্মহত্যার ফলে মানব সমাজের ইতিহাসে বহু শাহী খান্দান, ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর লোক সংঘবদ্ধ মানব গোষ্ঠীকে জৈবিক ও মানসিক দিক থেকে নিস্তনাবুদ করে দিয়েছে এবং এ ব্যবস্থার ফলেই বহু জাতি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।"[৪৬]

কলিন ক্লার্ক (Colin Clark) জন্মনিরোধের রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক ফলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লিখেনঃ

"ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা অতীত শতাব্দীগুলোর ইতিহাস থেকে ফ্রান্সবাসীর উনিশ শতকের প্রথমাংশে এবং বৃটেনবাসীর উক্ত শতকের শেষাংশে জনসংখ্যা হ্রাস করণের সিদ্ধান্ত এবং এর ফলে এসব দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা হ্রাস পেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়ার ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে।[৪৭]

জন্মনিয়ন্ত্রণকে জাতীয় পলিসী ও একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলন হিসাবে চালু করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর যে বিষময় ফল দেখা দিয়েছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত

---

৪৬. Sorokin, The American Sexual Revolution P. 78-79.

৪৭. লন্ডনের ১৫ই মার্চ, ১৯৫৯ তারিখের দৈনিক টাইম পত্রিকায় "ছোট পরিবার" (Too Small Families) শিরোনামায় লিখিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনসটিটিউটের ডিরেক্টর প্রফেসার কলিন ক্লার্কের প্রবন্ধ।"

চিত্র উপরে পেশ করা হলো। এ অবাঞ্ছিত ফল আজ সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। যেসব জাতির সংখ্যাতত্ত্ব উপরে প্রকাশ করা হলো, তারা তাদের জাতীয় জীবনের বসন্তকাল দেখে নিয়েছে। আল্লার সুন্নত (বিধান) মুতাবিক উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে এদের অধঃপতনের সকল আয়োজন এদেরই নিজেদের হাতে পূর্ণ হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য জাতি উন্নতির শিখরে উঠে যেসব নির্বুদ্ধিতা শুরু করেছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সবে মাত্র উন্নতির পথে অগ্রসরমান জাতির জন্যও কি সেসব নির্বুদ্ধিতার কাজ দিয়ে যাত্রার সূচনা করা উচিত হবে?

বিরূপ প্রতিক্রিয়া

পূর্বে যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তার ফলে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর দূরদর্শী লোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। চিন্তাবিদেরা এ অবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন। প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা সমস্যার নূতন নূতন রূপ দেখা যাচ্ছে এবং কিছু নূতন আন্দোলন শুরু হয়েছে ও হচ্ছে। এতদ্‌সঙ্গে বাস্তব কর্মপন্থায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমরা নিম্নে এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

ইংলন্ড–এদেশের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৬ সালে) একটি জাতীয় জন্মহার কমিশন (National Birth-Ratc Commission) নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনে চিকিৎসা, অর্থনীতি বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, শিক্ষা ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের মোট ২৩ জন বিশেষজ্ঞকে শামিল করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তা ডাঃ স্টিভেনসন, (Stevenson) এবং প্রধান মেডিকেল অফিসার স্যার আর্থার নিউজহোম (Newsholme) ও এতে যোগদান করেন। এ কমিশনের পক্ষ থেকে অনেকগুলো রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি রিপোর্ট নিম্নরূপঃ

"বৃটেনকে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্তি সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বেগ সহকারে চিন্তা করা উচিত এবং সংখ্যার নিম্নগতি রোধ ও একে যথা সম্ভব বৃদ্ধি করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।"

ইংলন্ডের স্বাস্থ্য দফতরের অধীনস্থ প্রধান মেডিকেল অফিসার স্যার জর্জ সিলম্যান জনসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"যদি জনসংখ্যার নিম্নগতি অব্যাহত থাকে তাহলে বৃটেন একটি ৪র্থ শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হবে।"

লন্ডন স্কুল অব–ইকনমিক–এর ডিরেক্টর স্যার উইলিয়াম বিভারিজ (Beveridege) এক বেতার ভাষণে বলেন যে, মৃত্যু ও জন্মের অনুপাত বর্তমানের

মত সামঞ্জস্যহীন অবস্থায় চলতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যে ইংলন্ডের জনসংখ্যা নিম্নগতি হয়ে পড়বে এবং পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে ২০ লক্ষ লোক কমে যাবে। লিভারপুল বিশ্বদ্যািলয়ের প্রফেসার কার সানডাসও প্রায় একই মত প্রকাশ করেন। এ বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য জন্মনিরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। এবং জাতীয় জীবন সংরক্ষণ সংস্থার (League of National Life) নামে ঐ দেশে একটি সংঘও কায়েম হয়েছে। এ সংস্থায় দেশের বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাগণ যোগদানকরেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও বৃটেনের শাসক শ্রেণী পুনরায় তীব্রভাবে জনসংখ্যা হ্রাস জনিত ক্ষতি অনুভব করেন, তাই ১৯৪৩ সালে বৃটেনের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র উজির (Home Secretary) মিঃ হার্বার্ট মরিশন বলেন যে, বৃটেনকে তার বর্তমান মর্যাদা কায়েম রাখতে ও ভবিষ্যতের তরক্কীর পথ খোলাসা করতে হলে, বৃটেনের প্রতিটি ঘরে শতকরা ২৫ জন হারে লোক বেশী হওয়া দরকার। সে সময় সে দেশের চিন্তাশীল লোকদের ধারণা ছিল এই যে, দুনিয়ার বুকে ইংল্যান্ডের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে নিজের স্বার্থেই জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি নূতন ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং জনসংখ্যার নিম্নগতি প্রতিরোধ করতে হবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে একটি রয়েল কমিশন গঠিত হয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ভবিষ্যতের জাতীয় পলিসী নির্ধারণের উপযোগী কোন কর্মসূচী পেশ করাই ছিল এই কমিশনের কাজ। কমিশন ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে রিপোর্ট পেশ করে এবং রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হয় যেঃ

> "পরিবারের ক্ষুদ্রাকৃতির প্রধানত এবং একমাত্র কারণ হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে বংশ সংকোচ করার প্রচেষ্টা।"

এ রিপোর্টে কমিশন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে যে, উনিশ শতক ও বিশ শতকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক অবস্থা বড় বড় পরিবারের উপর বিরাট বহরের অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এবং ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট ও শিক্ষা বিভাগীয় আইন-কানুন শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করার সম্ভাবনা দূরীভূত করেছে। এতদ্সঙ্গে অন্যান্য কতিপয় কারণ যুক্ত হয়ে পরিবারে বেশী সংখ্যক সন্তানের জন্মকে অর্থনৈতিক বোঝায় পরিণত করেছে এবং জনগণ জন্মরোধের মাধ্যমে পরিবারকে সীমিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। এরপর শিশুরা যেন পরিবারের অর্থনৈতিক দায় না হয়ে পড়ে এবং সন্তানের পিতা মাতা হওয়া যেন একটা বিপদে পরিণত না হয় সে জন্যে কমিশন বিস্তৃত সুপারিশাদী পেশ করেছে। কমিশনের সুপারিশগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রত্যেক পরিবারকে সন্তান সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাতা দান করতে হবে।

(২) ইনকাম ট্যাক্সের নিয়ম পরিবর্তন করে ছাপোষা লোকদের ট্যাক্স হ্রাস ও অবিবাহিতদের ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩) ব্যাপকাকারে এমন সব বাড়ী তৈরী করতে হবে যাতে তিনটার অধিক শোবার ঘর থাকবে।

(৪) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের পরিকল্পনার মাধ্যমে বড় বড় পরিবারগুলোর স্বচ্ছন্দে বসবাস করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) জনসংখ্যা সম্পর্কে স্থায়ী গবেষণা ও তৎসম্পর্কিত শিক্ষা দান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।

এমন কি কমিশন এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination) এর মত ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত পন্থা উদ্ভাবনের সুপারিশ পর্যন্ত করেছে। এসব সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য করে ইংলন্ডের সমাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন সে দেশে শিশুদের জন্য ভাতা নির্ধারিত হয়েছে। প্রসবকালে ছুটি, বিশেষ ভাতা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা এবং বাসস্থানের সুযোগ সুবিধা দিয়ে লোকদের সন্তান জন্মানোর ভয় থেকে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সুফলও দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে সে দেশে জন্মসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মহার ছিল হাজার প্রতি ১৪৮ কিন্তু ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জন্মসংখ্যার হার দাঁড়িয়েছে হাজার প্রতি ১৭৪টি। ১৯৩১–১৯৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড়পরতা হার ছিল ১,০৭,০০০ কিন্তু ১৯৫১–৬০ সালের মধ্যবর্তীকালে এ সংখ্যা ২,৫০,০০০–এ উঠেছে। সম্প্রতি আদমশুমারীর ফলাফলে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃটেনে বিগত দশ বছরে যে হারে জনসংখ্যা বেড়েছে গত অর্ধশতাব্দীর তুলনায় এর হার অনেক বেশী। ৪৮

ফ্রান্স–ফরাসী সরকার উপলদ্ধি করেছে যে, জন্মহার কমে যাওয়ার অর্থ ফরাসী জাতির ক্রমিক অধপতন। ফ্রান্সের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজ অনুভব করছেন যে, বর্তমান হারে জনসংখ্যা কমতে থাকলে, এমন একদিন আসবে যে দিন ফরাসী জাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আদমশুমারীর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯২১ সালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ২১ লক্ষ কমে গেছে। ১৯২৬ সালে ১৫ লক্ষ লোক বেড়েছে সত্যি, তবে তাদের বেশীর ভাগই অন্যান্য দেশ থেকে আগত। ফ্রান্সে ভিন্ন দেশীয় লোকদের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সে দেশে শতকরা ৭.২ জন অধিবাসী ভিন্ন দেশীয়। এটাও ফ্রান্সের জন্য নিতান্ত

উদ্বেগজনক বিষয়। কেননা উগ্র জাতীয়তাবাদের বর্তমান জামানায় কোনো জাতির লোকসংখ্যা কম হওয়া আর ভিন্ন জাতির লোকসংখ্যা ঐ দেশেই বেড়ে চলা ধ্বংসের পূর্বাভাস ছাড়া কিছুই নয়। ঐ বিপদ থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধার করার জন্য National Alliance for the Increase Population নামে সে দেশে একটি শক্তিশালী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ফরাসী সরকার জন্মনিরোধের শিক্ষা এবং প্রচারকেও বে-আইনী ঘোষণা করেছে। জন্মনিরোধের স্বপক্ষে প্রকাশ্যে বা গোপানে বক্তৃতা, রচনা বা পরামর্শ দান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন কি ডাক্তারদের প্রতি কড়া আদেশ জারী হয়েছে যে, তারা গোপনে বা প্রকাশ্যে এমন কোন কাজ করতে পারবেন না, পারবেনা যার ফলে জন্মনিরোধের পথ প্রশস্ত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সে দেশে প্রায় এক ডজন আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব আইনের ফলে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানকারী পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দান, তাদের ট্যাক্সের হার হ্রাসকরণ এবং বেতন, মজুরী ও পেন্সন বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের জন্য রেলের ভাড়া কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন কি বিশেষ মেডেল বিতরণেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। অপর দিকে যারা বিয়ে করে না কিংবা যাদের কোন সন্তান নেই, তাদের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স (Surtax) ধার্য করা হচ্ছে। অর্থাৎ অবস্থা বিগ্‌ড়ে যাবার পর ফরাসী জাতির চোখ খুলেছে এবং তারা স্বাভাবিক খোদায়ী বিধান পরিবর্তনের যে কুফল ভোগ করেছে, তার কাফ্‌ফারা আদায় করতে শুরু করছে।

নয়া ব্যবস্থার ফলে ফ্রান্সের জনসংখ্যা কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তা নিম্নের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

বছর	হাজার প্রতি জন্মহার
১৯৩৬-৪০	১৪.৫
১৯৪১.৪৫	১৫.১
১৯৪৬	২০.৬
১৯৪৭	২১.০
১৯৫৮	২৮.২

এ নয়া ব্যবস্থার ফলেই ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ফ্রান্সের জনসংখ্যা শতকরা ২৬ জন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জার্মানী-নাৎসীদের ক্ষমতা লাভ করার পর জনসংখ্যা হ্রাসের হার বৃদ্ধি হতে দেখে বিষয়টিকে অত্যন্ত 'বিপজ্জনক' বলে আখ্যা দান করে এবং এর প্রতিকার

প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। ঐ সময় একটি পত্রিকায় নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়ঃ

"যদি আমাদের জন্মহার বর্তমান অবস্থায় হ্রাস পেতে থাকে তাহলে আমাদের জাতি একদিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ্যা হয়ে যাবার আশংকা আছে। ফলে দেশের বর্তমান অধিবাসীদের স্থলাভিষিক্ত হবার উপযোগী নূতন মানব গোষ্ঠীর জন্ম আর হবে না।"

এ অচলাবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্যে জার্মান সরকার জন্মনিরোধের শিক্ষা ও প্রচারণাকে আইন জারী করে বন্ধ করে দেয়। স্ত্রীলোকদের কারখানা এবং অফিসের চাকুরী থেকে বহিষ্কার করতে শুরু করে। যুবকদের বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য 'বিয়ে-ঋণ' (Marriage Loan) নামে এক প্রকার আর্থিক ঋণ দানের ব্যবস্থা চালু করা হয়। অবিবাহিত ও সন্তানহীনদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয় এবং অধিক সংখ্যক সন্তানের মাতা-পিতাদের ট্যাক্স হ্রাস করা হয়। ১৯৩৪ সালে এক কোটি টাকা পর্যন্ত 'বিয়ে ঋণ' দান করা হয় এবং এরদ্বারা ৬ লক্ষ নর-নারী উপকৃত হয়। ১৯৩৫ সালের নূতন আইন অনুসারে স্থিরিকৃত হয় যে, একটি সন্তান জন্ম হলেই আয়কর শতকরা ১৫, দুইটি শিশুর জন্ম হলেই শতকরা ৩৫, ৩টি শিশুর জন্মের দরুন শতকরা ৫৫, ৪টি শিশুর জন্মের দরুন শতকরা ৭৫ এবং ৫টি সন্তানের দরুন শতকরা ৯৫ ভাগ কমিয়ে দেয়া হবে। আর ছয়টি সন্তানের জন্ম হলে আয়কর সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেয়া হবে। এসব ব্যবস্থার ফলে নাৎসী জার্মানীর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩১-৩৫ সালে জন্মহার প্রতি হাজারে ১৬.৬ জন ছিল। ১৯৩৬-৪০ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে হাজার প্রতি ১৯.৬ এ পৌছে।

ইতালী-মুসোলিনী সরকার ১৯৩৩ সালের পর বিশেষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার প্রোপাগান্ডাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বিয়ে ও সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স ও জার্মানী যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তার সব কয়টিই ইটালীতে প্রবর্তন করা হয়। ইটালীর আইনে স্পষ্ট ভাষায় একবার উল্লেখ করা হয় যে, যে কোনো কাজ, বক্তৃতা বা প্রচার যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থন সূচক হয়, তাহলে এ কাজ, বক্তৃতা বা প্রচার পুলিশ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্য অপরাধ এবং উক্ত অপরাধীকে এক বছরের কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এ আইন ডাক্তারদের উপরও প্রযোজ্য।

সুইডেন-কিছুদিন পূর্বে ট্রাইগার নামীয় সুইডেনের জনৈক প্রাক্তন উজীর পার্লামেন্টে (Ricksdag) বক্তৃতাকালে বলেছিলেনঃ "যদি সুইডিশ জাতি আত্মহত্যা করতে না চায় তাহলে নিত্যক্ষয়িষ্ণু জনসংখ্যা রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে উপায় উদ্ভাবন করা অত্যন্ত জরুরী। ১৯১১ সন থেকে জন্মহার কমতে শুরু হয়েছে এবং তা

বর্তমানে উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌছে গেছে। জন্মসংখ্যা আর বাড়ছে না।" এ সতর্কবাণীর ফলে সুইডিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ সালের মে মাসে একটি কমিশন নিয়োগ করে এবং উক্ত কমিশন তার দীর্ঘ রিপোর্টের মাধ্যমে একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করে। উক্ত কমিশন পরিবারের আকার বৃদ্ধির পরামর্শ দেয় এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য অন্তত ৩টি অথবা ৪টি সন্তানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। কমিশনের সুপারিশ মুতাবিক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করা হয়েছেঃ

- গর্ভনিরোধ ঔষধপত্রাদি বিক্রির উপর জাতীয় স্বাস্থ্য বোর্ডের কড়া নজর রাখা।
- ১৮ বছরের নিম্নবয়স্ক সন্তানের মাতাপিতাকে ট্যাক্স হ্রাসকরণ।
- অল্প ভাড়ার বাড়ী তৈরীকরণ।
- তিন বা ততোধিক সংখ্যক শিশুর জন্য ক্রমশ বার্ষিক রিবেট (Rebate) প্রদান।
- স্বাস্থ্য রক্ষা, বিশেষত শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ।

এ নয়া ব্যবস্থার ফলে সুইডেনের জন্মসংখ্যায় যে প্রভাব পড়েছে, তা স্পষ্টরূপে নিম্নের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায়ঃ

সাল		হাজার প্রতি জন্মহার
১৯৩১–৩৫	–	১৪.১
১৯৩৬–৪০	–	১৮.৭
১৯৪১–৪৪	–	১৯.৭

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে সুইডেনের জন্মহার পুনরায় হ্রাস পায়।

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তা থেকে নিশ্চয়ই জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ আন্দোলনের যুক্তি কি, কি কি কারণে এ মতবাদের জন্ম, কোন্ কোন্ উপায়–উপাদান এ ব্যবস্থার প্রসারে সাহায্য করেছে, যেসব দেশে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে এর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং যারা এথেকে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারা বর্তমানে কোন্ দৃষ্টিতে চিন্তা করছে; এসব বিষয় আপনার সম্মুখে এসেছে। এরপর আমাদের বিশ্বাস, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগি উপলব্ধি করা ও এর গভীরে প্রবেশ করা খুবই সহজ হবে।

ইসলামের মূলনীতি

পূর্বের আলোচনায় জন্মনিরোধের আন্দোলনের প্রসার, এর কারণ ও ফলাফলের যে বর্ণনা দান করা হয়েছে তা মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে দু'টি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ

একঃ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মনে জন্মনিরোধের ইচ্ছা জেগে ওঠা এবং বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে এর প্রসার লাভ করার কারণ তাদের সন্তান জন্মদান ও বংশ বৃদ্ধির প্রতি স্বাভাবিক বৈরাগ্য নয় বরং দু'শতাব্দী যাবৎ সেখানে যে ধরনের কৃষ্টি, সভ্যতা, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, তার দরুন তারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। যদি অবস্থা এরূপ হয়ে না পড়তো তাহলে আজও তারা ঊনিশ শতকের মতই জন্মনিরোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতো। কেননা পূর্বে এদের মনে সন্তানের প্রতি যে মহব্বত ও বংশ বৃদ্ধির প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, তা আজও বর্তমান আছে। মাত্র এক শতাব্দীকালের মধ্যে তাদের মনোভাবে কোন বিপ্লব আসে নি।

দুইঃ জন্মনিরোধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য জাতিগুলো যে সব জটিলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ আন্দোলন স্বাভাবিক ব্যবস্থায় যে রদবদল করতে চায়, তা মানব জাতির জন্য নিতান্ত ক্ষতিকর। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তনযোগ্য নয়। পরন্তু সভ্যতা, কৃষ্টি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির যে ব্যবস্থা মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত মুখে ঠেলে দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে, তা পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।

মূলনীতি

পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতালব্ধ উপরক্ত দুটি বিষয় আমাদেরকে ইসলামের মূলনীতির অনেক নিকটবর্তী করে।

ইসলাম মানুষের স্বভাবের অনুসারী জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি ও সমাজক্ষেত্রে তার যাবতীয় আদর্শ এ মূল সূত্রের ভিত্তিতে রচিত যে, মানুষ সমগ্র বিশ্বের স্বাভাবিক গতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের উল্টো পথে কখনও পা বাড়াবে না। কোরআন মজিদ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জীবকে পয়দা করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রকৃতিগতভাবে এমন পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন , যা অনুসরণ করে এ জীব অস্তিত্ব লাভের পর নিজের কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করার যোগ্য হয়–

رَبُّنَا الَّذِىٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى – طٰـه : ٥٠

–"আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি বস্তুকে বিশেষ ধরনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পাদন করার পথও বাতলিয়ে দিয়েছেন।"

সৃষ্টির সকল বস্তু বিনা দ্বিধায় এ হেদায়াত মেনে চলছে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবার বা এ পথে চলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার কোন ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয় নি। অবশ্য নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত করে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পথ আবিষ্কার করা ও সে পথে চলার চেষ্টা করাও তার ইচ্ছাধীন। তবে আল্লাহ্‌র তৈরী পথ পরিহার করে মানুষ নিজের খাহেশের অনুসরণ করে যে পথ তৈরী করে তা বক্র পথ এবং সে পথ ভ্রান্তিপূর্ণ–

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ – القصص : ٥٠

আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত যে নিজের নফ্‌ছের অনুসরণ করে চলে তার চাইতে অধিকতর গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) আর কে হতে পারে'?

এ গোমরাহীকে বাহ্যত যতই কল্যাণকর মনে করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ নির্দেশিত পথ পরিহার করে ও তার নির্দেশিত সীমা লংঘন করে মানুষ নিজের ওপরই যুলুম করে থাকে। কেননা তার ভুলকাজের পরিণাম তারই জন্যে ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে–

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ – الطلاق : ١

–"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত সীমা লংঘন করে, সে নিজেরই ওপর যুলুম করে থাকে।" আত–তালাক–১

কোরআন বলে যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট গঠন– প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করা আল্লাহ প্রবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করা শয়তানী কাজ। আর শয়তান এ ধরনের কাজের কুমন্ত্রণা দাতা–

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ – النساء : ١١٩

–"(শয়তান বললো) আমি আদম সন্তানদের আদেশ দেবো, আর তারা আল্লাহ্‌র গঠন–প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করবে।" আন নিসা–১১৭

আর শয়তান কে? সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে মানুষের দুশমন সেই শয়তানঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ * اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ - البقرة -١٦٨-١٦٩

-"তোমরা শয়তানের অনুসরণ কর না; কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সে তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ দান করে।"আল-বাকারা১৬৭-৬৮

ইসলামে যে, মূলসূত্রের উপর তার তাহজীব, তামদ্দুন, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির কাঠামো দাঁড় করেছে তা হচ্ছে ,মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিজের প্রকৃতিগত সকল চাহিদা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই পূর্ণ করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শক্তিগুলকে তাঁর নির্দেশিত পথেই কার্যকরী করবে। উপরন্তু সে কখনো আল্লাহপ্রদত্ত কোন শক্তিকে অকেজো বা নিস্ক্রিয় করে দিতে পারবে না এবং কোন শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লংঘন করবে না। এছাড়া শয়তানের প্রলোভন ও কুমন্ত্রণায় ভ্রষ্ট ও প্রকৃতির সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোন ভ্রান্ত পন্থায় নিজের কল্যাণ ও উন্নতির উপায় অনুসন্ধানও করবে না।

ইসলামী সভ্যতা ও জন্ম নিরোধ

উপরোল্লেখিত সূত্র স্মরণ রেখে ইসলামী আদর্শের প্রতি দৃষ্টি পাত করলে দেখা যাবে যে, যে সব বিষয়ের দরুন মানব প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ (অর্থাৎ সন্তান জন্মানো) থেকে বিরত থাকার কারণ দেখা দেয়, সে সব বিষয়ের মূলেই ইসলাম কুঠারাঘাত করে থাকে। এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের মানুষ হবার দরুণ জন্মনিরোধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নি। আর মানুষের জন্মগত প্রকৃতিও এ ধরনের কোনো প্রবণতা রাখে না, বরং একটা বিশেষ ধরনের সমাজ ব্যবস্থা মানব সমাজের ওপর চেপে বসার ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার ফলে মানুষ নিজের আরাম ও সুখ-সমৃদ্ধির খাতিরে নিজের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ বা সীমিত করার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপার থেকে আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, ভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়ে যদি পূর্বোল্লেখিত জটিলতা ও অসুবিধাগুলো সৃষ্টির পথই বন্ধ করে দেয়, তাহলে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে রদবদল, স্রষ্টার নির্দেশিত সীমা লংঘন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত পথ ধরে চলার কোন প্রয়োজনই দেখা দেবেনা।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ ব্যবস্থা সূদকে হারাম ঘোষণা করে, একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়, জুয়া ও কালোবাজারী অবৈধ ঘোষণা করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ এবং জাকাত ও মীরাসী আইন জারী করে থাকে। এর সব বিধান এসব কুপ্রথা দূর করে দেয়, যেগুলোর ফলে পাশ্চাত্য অর্থ ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ছাড়া বাকী সকল মানুষের জন্য এক আযাব স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে উত্তরাধিকার দান করেছে, পুরুষের উপার্জনে তার অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে-নর ও নারীর কর্মক্ষেত্রকে প্রাকৃতিক সীমারেখার আওতাধীন রেখেছে, পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশাকে পর্দার আইন মারফত নিষিদ্ধ করেছে এবং এভাবে অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থায় এ সব ত্রুটি দূর করে দিয়েছে যেগুলোর দরুন নারী সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালনের স্বাভাবিক কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানুষকে সরল ও আল্লাহভীরুর ন্যায় জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ-ববস্থা ব্যভিচার ও মদ্যপানকে হারাম করে দেয়, বহুবিধ মনোরঞ্জনকারী বাহুল্য কার্যকলাপ ও বিলাসিতা থেকে ফিরিয়ে রাখে, যেন সম্পদের

অসদ্ব্যবহার হতে না পারে; পোশাক, বাড়ীঘর ও বসবাসের সরঞ্জামাদির ব্যাপারে অল্প তুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে তাকিদ করে এবং পাশ্চাত্য সমাজের যেসব অপব্যয় ও সীমাতিরিক্ত ভোগ–স্পৃহা জন্মনিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে ধরনের মনোভাবের জন্মই হতে দেয় না।

এছাড়া ইসলাম পরস্পরের প্রতি সমবেদনা, শুভেচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিবেশী ও দরিদ্র অসহায়দের সাহায্যার্থে আল্লার পথে ব্যয় করার আদেশ দান করে। এসব বিধিবিধান পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজে এমন একটি নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যার ফলে জন্মনিরোধ করার কোন কারণই দেখা দিতে পারে না

সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম আল্লাহভীতির শিক্ষাদান করেছে– আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা শিখিয়েছে এবং মানুষের মন–মগজে এ সত্য তথ্যটি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করেছে যে, সকল জীবের প্রকৃত রেজেকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ। এর ফলে মানুষের মনে নিছক নিজের উপায় উপাদান ও নিজের যাবতীয় চেষ্টা যত্নের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার মত বস্তুবাদী মনোভাব জন্ম নিতেই পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যেসব কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিতে জন্মনিরোধ একটি আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পেরেছে, ইসলামের সমষ্টিগত আইন –কানুন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সে সব কারণের মুলোৎপাটন করে দিয়েছে। যদি মানুষ চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে খাঁটি মুসলমান হয়, তাহলে কখনও তার মনে জন্মনিরোধের আকাংখ্যা স্থান পেতে পারে না। আর তার জীবনে স্বাভাবিক পথ ছেড়ে দিয়ে বক্র পথে চলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না।

জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

এ যাবত যা আলোচনা হয়েছে তা ছিল নেতিবাচক (Negative) দিক। এখন ইতিবাচক (Positive) দিকও আলোচনা করা দরকার। জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি?

কোরআন মজিদের এক আয়াতে تغير خلق الله (আল্লাহর) সৃষ্টি কাঠা–মোতে রদবদলকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যাদান করা হয়েছেঃ

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ – النساء : ١١٩

–"(শয়তান বললো) আমি এদের হুকুম দেবো আর এরা তদনুযায়ী সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদল করবে।" আন–সিনা–১১৭

এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদল করার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অথবা তাকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ মূলনীতির মাপকাঠিতে দেখা দরকার যে, নর ও নারীর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এবং জন্মনিরোধের দ্বারা উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন হয় কি না। এ প্রশ্নের উত্তর কোরআন থেকেই আমরা পেয়ে থাকি। কোরআন নর ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে দুটি উদ্দেশ্য পেশ করে।

একটি হচ্ছেঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

–"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ফসলের জমির মত। সুতরাং তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী জমিতে যাও এবং ভবিষ্যতের সংস্থান কর।" আল–বাকারাহ–২২৩

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً – الروم : ٢١ ـ

–"আর আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনগুলোর মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের মধ্যে যেন পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হয়।" আর–রুম–২১

প্রথম আয়াতে নারীদেরকে 'ফসলের জমি' আখ্যা দিয়ে একটি জৈনিক সত্য (Biological fact) পেশ করা হয়েছে। জীব বিজ্ঞান মুতাবিক নারীর মর্যাদা ফসলের জমির মতই, আর পুরুষের অবস্থা চাষীর মত। আর উভয়ের মিলনের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা। এ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মানুষ, জন্তু জানোয়ার ও গাছপালা সবাই সমান।[৫০]

---

৫০. জনৈক ভদ্রলোক এ আয়াত থেকে জন্মনিরোধের সমর্থন হাসিল করার জন্যে এক অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, জমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক শুধু ফসল উৎপাদনের জন্যে। যখন দেশে ফসলের প্রয়োজন থাকে তখন কৃষক জমিতে যাবে। আর যখন ফসলের কোন দরকার থাকবে না তখন জমিতে যাবার কোন অধিকার থাকবে না। তাছাড়া যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করা দরকার, চাষী সে পরিমাণ চাষ করবে, এর বেশী নয়। এ অদ্ভুত তফসীর অনুসারে

দ্বিতীয় আয়াতে নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপনের আরও একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়িত্ব। স্বামী -স্ত্রীর মিলিত জীবন যাপনই তমদ্দুনের বুনিয়াদ। এ উদ্দেশ্যটা মানুষেরই জন্যে ,আর মানুষের দৈহিক সৃষ্টির মধ্যেই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার যাবতীয় উপাদান মওজুদ রাখা হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি বা খালকুল্লাহর ব্যাখ্যা

এ বিশ্বের বিরাট কারখানা পরিচালনার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক সর্বব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্য বিষয়ক আর অপরটি বংশ বিস্তার। খাদ্য বিষয়ক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যে সব সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে তাদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থেকে কারখানার কাজ পরিচালিত করতে হবে। এ জন্যে মহান প্রতিপালক প্রভূ প্রচুর খাদ্য সরবরাহ করছেন। দেহের অভ্যন্তরস্থ অংশগুলোতে খাদ্য হজম করা এবং সেগুলোকে দেহের অংশে পরিণত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। উপরন্তু এ উদ্দেশ্যেই খাদ্যের প্রতি সৃষ্টির একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এর ফলেই তাদের প্রত্যেকে খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ ব্যবস্থার অভাবে প্রত্যেক দেহধারী (উদ্ভিদ, জন্তু অথবা মানুষ) ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সৃষ্টির এই বিরাট কারখানা শ্রীহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু স্রষ্টার নিকট সৃষ্টি জীবের জীবন রক্ষার চাইতেও বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা বহাল রাখার গুরুত্ব বেশী। কেননা, ব্যক্তির জীবনকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং এ সীমাবদ্ধ আয়ু শেষ হবার আগেই বিশ্বের কারখানাকে সচল রাখার জন্যে তার স্থান দখলকারী তৈরী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এ দ্বিতীয় ও মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যেই

প্রথমত, বন্ধ্যা নর-নারীর মিলন হারাম হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, গর্ভ ধারনের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মিলন পরবর্তী সন্তান জন্মানোর প্রয়োজনীয়তা প্রামাণিত হবার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। তৃতীয়ত, স্বামী -স্ত্রীর গোপন সম্পর্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। যখন সরকার ঘোষণা করবে যে, আমাদের দেশে আর সন্তানের প্রয়োজন নেই তখন থেকে সকল স্বামী-স্ত্রী পরস্পর থেকে পৃথক থাকতে হবে, যতক্ষণ পুনরায় কোন সরকারী ঘোষণায় সন্তান জন্মানোর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ না করা হয়। আর পুনরায় ঘোষণা করা মাত্রই সকল স্বামী-স্ত্রী মিলিত হবে এবং এর ফলে কত সংখ্যক নারী গর্ভবতী হয়ে গেল সরকারকে তার রিপোর্ট সংগ্রহ করে সময় মত লাল নিশান তুলে ধরতে হবে যেন পুনরায় স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। রবুবিয়াতের এ ব্যাপক পরিকল্পনা এমন চিত্তাকর্ষক যে কম্যুনিষ্টরাও এ যাবত এর সন্ধান পায় নি। আর মজার ব্যাপার এই যে,বিষয়টা কোরআন থেকেই বের করা হয়েছে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে কৃষক ও জমিনের সঙ্গে যে তুলনা করা হয়েছে, এ শব্দার্থ মুতাবিক অর্থ গ্রহণ করেও আজ পর্যন্ত কারো মগজে এ অর্থ প্রবেশ করে নি যে, জমিতে বীজ বপন করার পর কৃষকের জন্যে জমিতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

স্রষ্টা সন্তানাদি জন্মের ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টিকে পিতৃ ও মাতৃশক্তিতে বিভক্ত করা, উভয়ের দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য রাখা, উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং দাম্পত্য জীবন কায়েম করার জন্যে উভয় পক্ষের মনে প্রবল আকাঙ্খা দান ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উভয়ে যুক্ত হয়ে তাদের মরণের পূর্বেই আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়াকে সচল ও সক্রিয় রাখার উপযুক্ত কর্মী তৈরী করার জন্যে সতত আগ্রহশীল। এ না হলে পিতৃ ও মাতৃশাক্তির পৃথক পৃথক সৃষ্টিরই কোন প্রয়োজন হতো না।

পুনরায় লক্ষণীয় যে, যে জীবের সন্তান অনেক বেশী সংখ্যক হয় তাদের মধ্যে স্রষ্টা সন্তান লালন–পালন ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্যে খুব বেশী আগ্রহ ও স্নেহ–মমতা দান করেন নি। কারণ এ সৃষ্ট জীবেরা শুধু বিপুল সংখ্যক সন্তান জন্মের কারণেই বংশ টিকিয়ে রাখে। কিন্তু যেসব জীবের সন্তান কম হয় তাদের মনে স্রষ্টা এত সন্তান বাৎসল্য দান করেছেন যে, মাতা পিতা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষনাবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়। মানব সন্তান সকল সৃষ্ট জীবের তুলনায় দুর্বলতম হয়ে জন্মায় এবং তাকে দীর্ঘকাল মাতা পিতার তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করতে হয়।

পক্ষান্তরে পশুদের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মানুষের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এজন্যেই মানব জাতির মধ্যে নর ও নারী পরস্পরের সঙ্গে স্থায়ীভাবে প্রেম–প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এ দুটি বস্তুই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। আর এখান থেকেই পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ রচিত হয়। পরিবার থেকে বংশ আর বংশ থেকে গোত্র হয়। আর এভাবেই সভ্যতার বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে।

এবার মানুষের গঠন বৈচিত্র দেখা যাক। জীব–বিজ্ঞান অধ্যয়নে জানা যায় যে, মানুষের দেহ গঠনে ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে বংশধরের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর মানুষের দেহে যত উপকরণ আছে, তার মধ্যে দেহের নিজস্ব কল্যাণের চাইতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে অনেক বেশী। মানব দেহের যৌন গ্রন্থিগুলো এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। এ গ্রন্থিগুলো একদিকে মানব দেহে 'হরমোন' (Hormon) বা জীবন–রস সঞ্চার করে এবং এর ফলে দেহে একদিকে সৌন্দর্য, সুষম্য, কমনীয়তা, সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা, চলৎশক্তি, বলিষ্ঠতা ও কর্মশক্তি সৃষ্টি হয় এবং অপর দিকে এ যৌন গ্রন্থিই প্রজনন শক্তি সৃষ্টি করে নর ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করে। যে সময় মানুষ বংশ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার যোগ্য থাকে, জীবনের সে অংশেই তার যৌবন, সৌন্দর্য

ও কর্মশক্তি বিদ্যমান থাকে। আর যে সময় সে সন্তান জন্মানোর অযোগ্য হয়ে পড়ে, জীবনের সে অংশটাই দৌর্বল্য ও বার্ধক্যের জমানা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যস্থিত গোপন সম্পর্ক রক্ষায় দুর্বলতা আগমনের মানেই হলো মরণের অগ্রিম নোটিশ লাভ। যদি মানুষের দেহ থেকে তার যৌন গ্রন্থিকে বাদ দেয়া যায় তাহলে সে একদিকে যেমন মানব বংশ বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকার ব্যাপারে অসমর্থ হয়ে পড়ে তেমনি অপর দিকে তার মানবীয় যোগ্যতা এবং কর্মশক্তিও বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কেননা যৌনগ্রন্থির অবর্তমানে দেহ ও মস্তিষ্কের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

নারীদেহ সৃষ্টিতে বংশ বৃদ্ধির কাজটিকে পুরুষের দেহের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, নারী দেহের যাবতীয় কল-কব্জা শুধু বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখনই তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়। এ ব্যবস্থা দ্বারা নারীদেহ প্রতি মাসেই গর্ভধারণের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। শুক্রকীট গর্ভাধারে স্থান লাভ করা মাত্রই নারীদেহে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়। ভাবী সন্তানের কল্যাণকারিতা তার সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থার ওপর সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তার জীবন রক্ষার জন্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ দৈহিক শক্তি ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই নারীর স্বভাবেই স্নেহ, প্রীতি, ত্যাগ, কষ্ট ও সাহিষ্ণুতা (Aleruism) বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর এজন্যই পিতৃত্বের সম্পর্কের তুলনায় মাতৃত্বের সম্পর্ক অধিকতর গভীর ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। সন্তান প্রসবের পর নারী-দেহে দ্বিতীয় একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং এর ফলে নারী সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্যে তৈরী হয়। এ সময় নারী - দেহের দুগ্ধগ্রন্থিগুলো তার খাদ্যের উত্তম অংশকে টেনে নিয়ে সন্তানের জন্যে দুধ সরবরাহ করার কাজে নিয়োজিত থাকে এবং এখানেও নারীকে ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্যে আর এক দফা ত্যাগ স্বীকার করে নিতে হয়। সন্তানের জন্যে দুধ সরবরাহ করার কাজ থেকে অবসর প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী হতে হতে নারী পুনরায় সন্তান ধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে। এ কার্যকারণ-পরম্পরা নারীর বংশ বৃদ্ধির যোগ্যতা থাকাকাল পর্যন্ত জারী থাকে। আর যখনই এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই সে মরণের পথে পা বাড়ায়। বার্ধক্যের জমানা শুরু হতেই তার সৌন্দর্য ও সুষমা বিদায় নেয়, তার দৈহিক সজীবতা, কমনীয়তা ও আকর্ষণ খতম হয়ে যায় এবং দৈহিক যন্ত্রণা, মানসিক নিরাশক্তি ইত্যাদির এমন এক নয়া যুগের সূচনা হয়, যার সমাপ্তি ঘটে মরণের সঙ্গেই। এ আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, নারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে যতদিন জীবন ধারণ করে ততদিনই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ জমানা। আর জীবনের যে সময়টুকু নিজের জন্যে বেঁচে থাকে সে সময়টা তার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর সময়।

এ বিষয়ে অ্যান্টন নিমিলোভ (Anton Nemilov) নামক জনৈক রুশীয় লেখক একটি চমৎকার বই লিখেছেন। বইটির নাম Biological Tragedy of Woman (বায়োলজিক্যাল ট্রাজেডী অব ওম্যান)। ১৯৩২ সালে লন্ডনে এর ইংরেজী তরজমা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তক অধ্যয়নে জানা যায় যে, নারী–জন্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব বংশ রক্ষা। অন্যান্য গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণও এ ধরনেরই মত প্রকাশ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ডাক্তার এলিক্সিস্ ক্যারেল (Alixis Carrel) তাঁর Man the Unknown (অজ্ঞাত জীব মানুষ) গন্থে উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করতে গিয়ে বলেন, "নারীর সন্তান জন্ম দানের যে কর্তব্য এটা কি পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ তা আজও সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এ দায়িত্ব প্রতিপালন করা নারীত্বের পূর্ণতার জন্যে অপরিহার্য। সুতরাং নারীদের সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।"

যৌনবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ Dr. Oswald Schwarz (ডাঃ ওস্ওয়াল্ড সোরজ) তাঁর The Psychology of Sex (যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কিত মনস্তত্ব) বইয়ে লিখেনঃ

"যৌন প্রেরণার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য কি এবং এটি কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সৃষ্ট? এ প্রেরণার সম্পর্ক যে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে, এটা সুস্পষ্ট। এ কথা উপলব্ধি করার ব্যাপারে জীব–বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করে থাকে। এটা একটা প্রমাণিত জৈবিক বিধান যে, দেহের প্রতিটি অংগ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে তৎপর এবং প্রকৃতি এদের প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা পূরণ করার জন্যে সতত উদগ্রীব। এ দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করলে জটিলতা ও বিপদ অনিবার্য। নারী দেহের বৃহত্তর অংশ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। যদি কোন নারীকে তার দেহ ও মস্তিষ্কের এ দাবী পূরণ করা থেকে বিরত রাখা যায়, তা হলে সে দৈহিক ক্ষয় ও পরাজয়ের শিকারে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে সে মা হতে পারার মধ্যে এক নয়া সৌন্দর্য ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করে, যা তার দৈহিক ক্ষয়ক্ষতির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে।" (১৭পৃষ্ঠা)

এই লেখক আরো লিখেছেনঃ

"আমাদের দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করতে চায় এবং কোনো অংগকে তার দায়িত্ব পালন থেকে নিরস্ত করলে এর পরিণতি স্বরূপ সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা দেখা দেয়। একটি নারীর শুধু এজন্যে সন্তানের প্রয়োজন হয় না যে, তার মাতৃত্ব এটা দাবী করে অথবা সে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনকে তৎপ্রতি আরোপিত একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করে, বরং এজন্যে তার সন্তানের প্রয়োজন যে, তার দৈহিক ব্যবস্থাপনা শুধু এ উদ্দেশ্যেই বিন্যস্ত হয়েছে। যদি তার

দেহের এ সৃষ্টি–কার্যকে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে সমগ্র দৈহিক ব্যবস্থাপনায় এক শূণ্যতা, বঞ্চনা ও পরাজয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়।"

এ আলোচনা থেকে এবং কোরআন মজিদে বর্ণিত তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য বংশ বৃদ্ধি এবং এ সংগে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবন যাপন করে মানবীয় তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন। আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা শুধু এজন্যে, যেন মানুষ তার মজ্জাগত প্রেরণার চাপে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে। এখন যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে চায় এর পরিণতিকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে (খালকুল্লাহ্‌) পরিবর্তন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে। আল্লাহ তায়ালা তাকে যেসব অঙ্গ–প্রতঙ্গ মানব বংশ বৃদ্ধির জন্যে দান করেছেন সেগুলোকে সে আসল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিছক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে নিয়োগ করে। এমন ব্যক্তির সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে–যে শুধু রসনা তৃপ্তির জন্যে ভাল ভাল খাদ্য চিবিয়ে গিলে ফেলার পরিবর্তে বাইরে নিক্ষেপ করে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মত এক ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ উপভোগ করে যদি মানব বংশ বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে, তাহলে সে নিজেরই ভবিষ্যৎ বংশকে হত্যা করে। এটাকে আত্মবংশ হত্যা বলা খুবই সংগত। শুধু তাই নয়, বরং আমি বলবো যে, ঐ ব্যক্তি প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে। প্রকৃতি যৌন মিলনে যে সুখানুভূতি রেখেছে তা শুধু বংশ–বৃদ্ধির প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার পুরস্কার। কিন্তু যে ব্যক্তি পুরামাত্রায় পুরস্কার চায় অথচ কর্তব্য পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, সে কি ধোঁকাবাজ নয়?

ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান

প্রকৃতির সঙ্গে যারা এ ধরনের ধোঁকাবাজি করে, প্রকৃতি কি তাদেরকে কোন সাজা না দিয়েই ছেড়ে দেয় অথবা কোন সাজা দিয়ে থাকে? কোরআন মজিদ বলে যে, এদের অবশ্যই সাজা দেয়া হয় এবং সে সাজা হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কাজে যারা লিপ্ত হয়, তারা লাভবান হবার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ – الانعام : ١٤٠ ـ

–"যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে আল্লাহ্‌রই প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে নিজেদের জন্য হারাম[৫১] করে দিয়েছে এবং সন্তানদের হত্যা করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" আল–আনয়াম–১৪০

এ আয়াতে সন্তান হত্যার সঙ্গে সঙ্গে বংশধররূপ নেয়ামতকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়াকেও ক্ষতি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষতি কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাই এখন দেখা দরকার।

একঃ দেহ ও আত্মার ক্ষতি

সন্তানের জন্ম ও বংশ বৃদ্ধি যেহেতু সরাসরি দেহ ও আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত, সেজন্যে সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে দেহ ও আত্মার ওপর কি প্রভাব পড়ে তাকে তা অনুসন্ধান করা দরকার।

---

৫১. পুরাতন তফসীরকারকগণ– حرموا ما رزقهم الله এর অর্থ হালাল খাদ্যকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নেয়া বলে লিখেছেন। এর কারণ এই যে, তাঁদের জমানায় জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন আন্দোলনের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যতের ওপর সমভাবে বিস্তৃত, সেজন্যে তিনি এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ শুধুমাত্র হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি নেয়ামতই এর মধ্যে শামিল হয়েছে। অভিধান ও পারিভাষিক অর্থ অনুসারে' রিজিক' শুধু খাদ্যবস্তুই নয়, বরং প্রতিটি দান এর অন্তর্ভুক্ত। সন্তান দানও রিজিকেরই এক অংশ; আর যেহেতু এখানে সন্তান হত্যার পর পরই রিজককে নিজেদের জন্যে হারাম করে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেজন্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সন্তান হত্যাকারিগণ যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ঠিক সেভাবেই সন্তানের জন্মকে নিজেদের জন্যে যারা হারাম করে নেয়, তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ওপরে আলোচনা করা হয়েছে যে, সৃষ্টিকে পুরুষ ও স্ত্রী দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তান জন্মানো, বংশ বৃদ্ধি ও সৃষ্টি রক্ষা। এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর প্রকৃতিগত প্রেরণা সন্তান জন্মানোকেই উৎসাহিত করে। বিশেষত মানব জাতির মধ্যে নারী গোষ্ঠীর মনে স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের ভালোবাসার ও কামনার এক প্রবল প্রেরণা স্থান পেয়েছে। উপরন্তু মানবদেহে যৌনগ্রন্থি কি পরিমাণ সুদূর প্রসারী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এ গ্রন্থিগুলো মানুষকে স্বজাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, সৌন্দর্য সুষমা, কর্মতৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কিভাবে দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করে থাকে, তাও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, বিশেষত নারী সম্পর্কে আপনি জানতে পেরেছেন যে, তার দেহের সকল যন্ত্রপাতিই মানব বংশের খেদমতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যই এটি এবং তার প্রকৃতি তার নিকট এ দাবীই উত্থাপন করে থাকে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আপনার মন আপনা-আপনিই উপভোগ করতে এবং এর স্বাভাবিক প্রতিফলের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে (যদিও এ ফল লাভ করার জন্যে তার দেহের প্রতিটি অনু-পরমাণু আগ্রহান্বিত) তখন তার দেহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও যৌনগ্রন্থির কর্মশক্তি অব্যাহত না হওয়া অসম্ভব।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। ১৯২৭ সালে গ্রেট বৃটেনের National Birth Rate Commission (জাতীয় জন্মহার কমিশন) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে লেখা হয়েছিলোঃ

"জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণাদি ব্যবহার করার ফলে দৈহিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। সাময়িকভাবে নপুংসকত্ব অথবা পুরুষত্বের দুর্বলতা দেখা দেয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, এসব উপকরণ ব্যবহারের ফলে পুরুষের দেহে তেমন কোন মন্দ প্রতিক্রিয়ার আশংকা নেই। অবশ্য সর্বদাই এ আশংকা বর্তমান থাকবে যে, জন্মরোধকারী উপকরণাদি ব্যবহারের ফলে পুরুষ যখন দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে তখন তার পারিবারিক সুখ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সে অন্য উপায়ে সুখানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করবে। এর ফলে তার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হবে, এমন কি ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশংকা আছে।"

পুনঃ নারী সমাজ সম্পর্কে কমিশণ বলেঃ

"যদি স্বাস্থ্যগত কারণে জন্মনিরোধ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সন্তান জন্মহার

সীমাতিরিক্তরূপে বেশি হয়, তাহলে জন্মনিরোধ সন্দেহাতীতরূপে নারীদেহের জন্যে উপকারী হবে। কিন্তু এ সব অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া জন্মনিরোধ প্রবর্তন করার ফলে নারীদেহের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। তার মেজাজ ক্ষিপ্ত ও খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে। মানসিক চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ার দরুন স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে, বিশেষত যারা 'আজল করে'[৫২] (Coitus interruptus) থাকে সে দম্পতির এ- অবস্থা দেখা যায়।"

ডাঃ মেরী সারলেইব (Dr. Mary Scharlieb) তার দীর্ঘ ৪০বছরের অভিজ্ঞতা এভাবে পেশ করেনঃ

"জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে 'পেশারী' (pessaries), জীবাণুনাশক ঔষধ, রবারের থলে, টুপী অথবা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহারের ফলে তৎক্ষণাৎই কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ এসব ব্যবহার করার ফলে মধ্যবর্তী বয়সে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নারীদেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশৃংখলা (Nervous instability) দেখা দেয়। নিস্তেজ অবস্থা, নিরানন্দ মনোভাব, উদাসীনতা, খিটখিটে মেজাজ, রুক্ষতা, বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা, চিন্তার অস্থিরতা, মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা, রক্তচলাচল হ্রাস, হাত পা অবশ হওয়া, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, অনিয়মিত মাসিক ঋতু ইত্যাদি হচ্ছে এ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।"

অন্যান্য ডাক্তারের মতে জন্মনিরোধ উপকরণ ব্যবহারের ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Falling of the Womb) জীবাণু সংরক্ষণে অক্ষমতা এবং প্রায়শ মস্তিষ্ক বিকৃতি, হৃদকম্প ও উন্মাদরোগ পর্যন্ত দেখা দিয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘকাল যাবৎ যে নারীর সন্তান জন্মায় না তার সন্তান ধারণোপযোগী প্রত্যঙ্গাদিতে এ ধরনের শৈথিল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয় যে, পরবর্তীকালে সে গর্ভধারণ করলেও গর্ভ ও প্রসবকালে তাকে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।[৫৩]

প্রফেসার লিউনার্ডবিল, এম. বি. একটি প্রবন্ধে লিখেনঃ

"সাবালকত্ব প্রাপ্তির সময় নারীদেহে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়, তা সবই সন্তান ধারনের জন্যে। পুনঃপুনঃ নারীকে সন্তান ধারণের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে মাসিক ঋতু হয়। যৌন সম্পর্কহীন অথবা জন্মরোধকারী নারীর দৈহিক

---

৫২. স্ত্রীসংগমকালে চরমানন্দের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গকে স্ত্রী–অঙ্গ থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করা।

৫৩. ডাঃ আর্ণল্ড লুরাণ্ড (Lurand) তাঁর Life Shortening Habits and Rejuvenation গ্রন্থে জন্মনিরোধ প্রণালীর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। এ গ্রন্থ ১৯২২ সালে ফিলিডেলফিয়া থেকে মুদ্রিত হয়েছে।

অন্ত্রীগুলো ঋতুকালে উত্তেজিত হয়ে পুনরায় ঋতুশেষে আচ্ছন্ন হয়। এ স্বাভাবিক চাহিদা অপূর্ণ থাকা এবং সন্তান ধারণের জন্যে উদগ্রীব অঙ্গগুলোর নিষ্ক্রিয় রাখার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ গর্ভ ধারণোপযোগী প্রত্যঙ্গসমূহে উত্তেজনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি, অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুকালে নানাবিধ কষ্ট, স্তন ঝুলে পড়া, মুখের কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের বিদায় গ্রহণ এবং মেজাজে রুক্ষতা ও উদাসীনতা দেখা দিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনে তার যৌন গ্রন্থির প্রভাব খুব বেশি। যে গ্রন্থি দাম্পত্য মিলনের শক্তি পয়দা করে সেই গ্রন্থিটিই মানুষের দেহে পরিপুষ্টতা, সৌন্দর্য ও তৎপরতা সৃষ্টি করে। এখান থেকেই মানবীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তবয়স্কা হবার অব্যবহতি পূর্বে যখন গ্রন্থিগুলো সতেজ হয়ে ওঠে তখন যেভাবে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা সৃষ্টি হয় ঠিক সেভাবেই সৌন্দর্য, কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক শক্তি, যৌবন ও কর্মশক্তি পয়দা হয়। যদি এসব অংগের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা না হয় তাহলে এরা তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালনেও শিথিল হয়ে পড়ে। বিশেষত নারীকে গর্ভ ধারণ থেকে বিরত রাখার অর্থ হচ্ছে তার সমগ্র দৈহিক যন্ত্রকে বিকল ও নিরর্থক করে দেয়া।"

ইতিপূর্বেও আমরা ডক্টর আসওয়াল্ড শোয়াজের মন্তব্য আলোচনা করেছি। তিনি লিখেনঃ

"এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ জৈবিক আইন যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ তৎপ্রতি অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে সর্বদা উদগ্রীব। আর যদি তাদের এসব দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তা হলে অনিবার্যরূপেই জটিলতা ও বিপদ দেখা দেবে। নারীদেহ গর্ভ ধারণ ও সন্তান জন্মানোর জন্যেই সৃষ্টি। যদি নারীকে তার ঐ দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তার দেহ ও মনে নৈরাশ্য ও পরাজয়ের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এ ছাড়া সন্তান প্রসবের দুরুন তার দৈহিক যন্ত্রে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকারই হচ্ছে মাতৃত্বের আস্বাদ ও সন্তান লাভজনিত মানসিক তৃপ্তি।"[৫৪]

জন্মনিরোধ যে নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সঙ্গে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

একদিকে তো জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্যে যেসব পন্থা অবলম্বন করা

---

৫৪. The Psychology of Sex. London 1951 Page, 17.

হয় তা নর ও নারী উভয়ের, বিশেষত নারী দেহে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন সে এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বহু পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে গর্ভপাত (Abortion)। গর্ভনিরোধের (Contraceptives) উপায়-উপাদানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও আজ অবধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বহুলভাবে গর্ভপাত ব্যবস্থা চালু আছে। কোন কোন দেশে শুধু গর্ভপাতের জন্যই ক্লাব এবং ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এর কারণ, গর্ভনিরোধকারী উপকরণাদির কোন একটিও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। এসব উপকরণ ব্যবহার সত্ত্বেও অনেক সময় গর্ভসঞ্চার হয়ে যায় এবং নিজের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিযায় আগমনেচ্ছু সন্তানটিকে হত্যা করে ফেলে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ সাধারণত দাবি করেন যে, 'পরিবার পরিকল্পনা' গর্ভপাতের হার হ্রাস করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। Paul H. Gebhard-এর উক্তি মুতাবেক আমেরিকায় বর্তমানে শতকরা ৮ জন নারী বিয়ের পূর্বে এবং শতকরা ২০ থেকে ২৫ জন বিয়ের পরে গর্ভপাতের পন্থা অবলম্বন করে থাকে।[৫৫] জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে জন্মনিয়ন্ত্রের ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু গভীর দৃষ্টি সহকারে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সে দেশে এ আন্দোলনের ফলে গর্ভপাত অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে শতকরা ২৯ ১/২টি পরিবারের মধ্যে এ অবস্থা জারী হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে এ সংখ্যা শতকরা ৫২তে পৌঁছেছে। প্রফেসর সাউভী (Sauvy)-এর মতে জাপানে প্রতি বছর ১২ লক্ষ গর্ভপাত হয় এবং বেআইনী গর্ভপাতকে এর মধ্যে গণনা করলে (২০ লক্ষের কম কিছুতেই নয়) এ সংখ্যা অনেক বেশি হবে।[৫৬]

জাপানের বিখ্যাত দৈনিক মাইনীচির (Mainichi) উদ্যোগে যে সার্ভে করা হয় তা থেকে জানা যায় যে, যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের মধ্যে গর্ভপাতের সংখ্যা-জন্মনিয়ন্তণ যারা করে না-তাদের তুলনায় ছয় গুণ বেশি।[৫৭]

ইংলণ্ড সম্পর্কে রয়েল কমিশণও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যদের তুলনায় ৮.২৭ গুণ বেশি গর্ভপাত হয়ে থাকে।

---

৫৫. Gebhard Paul H. Pregnancy. Birth and Abortion, New York, 1958 P.P. 56 & 119.

৫৬. McCormack Arther, People, Space, Food. London 1960, Page 67.

৫৭. ঐ ৮৬, পৃঃ ১৯ নং টীকা।

আমেরিকার প্রিন্টন ইউনিভারসিটির প্রফেসার আইরীন বি টিউবার (Irene B. Taeuber) ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গর্ভনিরোধক উপকরণাদির আগমনের সঙ্গে গর্ভপাতের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে এবং এটা বর্তমানে শুধু বিবাহিতা নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কুড়ি বছরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।[৫৮]

গর্ভপাত যে নারীর স্বাস্থ্য ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক ব্যবস্থার জন্যে ধ্বংসাত্মক এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞই একমত। আমরা এখানে শুধু ডাঃ ফ্রেড্রীক টৌসেগের মতামত উদ্ধৃত করবো। তিনি এ বিষয় সম্পর্কিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতামত নিম্নের ভাষায় পেশ করেছেনঃ

"নারীর গর্ভকাল পূর্ণত্বে পৌছার পূর্বে যদি গর্ভস্থ সন্তানকে স্থানচ্যুত (Abortion) করা হয় অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, গর্ভপাত ঘটানো হয়, তাহলে মানব বংশকে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়ঃ প্রথমত, এক অজ্ঞাত সংখ্যক মানব বংশকে দুনিয়াতে আসার আগেই হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়, গর্ভপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী মাতাদের এক বিরাট সংখ্যা মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

তৃতীয়, গর্ভপাতের ফলে বিপুল সংখ্যক নারীর দেহে এমন সব রোগের প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে ভবিষ্যতে সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়।"[৫৯]

গর্ভপাত ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের অপরাপর উপায় হচ্ছে, জন্মনিরোধ (Contraceptives); কিন্তু এগুলো সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যেঃ

(১) এসব উপায়-উপাদানের কোনটাই অব্যর্থ ও নির্ভরযোগ্য নয় এবং

(২) কোন একটি উপকরণও এমন নেই যেটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহের জন্য ক্ষতিকর নয়। "

ডাঃ ক্লেয়ার ফোলসোম (Clair E. Folsomc) এর ভাষায়ঃ

---

৫৮. McCormack-এর উল্লিখিত বইয়ের ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৯. Taussing, Fredrik J., "The Abortion Problem" Proceedings of the Conference of National Committee on Maternal Health, Baltimore 194. Page-39.

"আমাদের আজ পর্যন্ত জন্মনিরোধের উপযোগী সহজ, সস্তা ও দেহের জন্যে ক্ষতিকর নয় –এমন কোন উপায় জানা নেই।"৬০

জন্মনিরোধের সকল পন্থাই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শুধু যে চিন্তার বিপর্যয় দেখা দেয় তাই নয়, বরং যৌন ক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে সুখানুভব করে থাকে সে আস্বাদটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।৬১

ডাঃ স্যাতিয়াওতি তার, 'পরিবার পরিকল্পনা' (Family Planning) নামক গ্রন্থে নিম্ন ভাষায় এ তথ্য পেশ করেছেনঃ

"কোন কোন অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে থাকে। মনের শান্তি বিদায় গ্রহণ করে এবং তদস্থলে অস্থিরতা দেখা দেয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক প্রকার চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। ঘুম মোটেই হয় না। উম্মাদ ও মূর্ছা রোগের আক্রমণ হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নারী বন্ধ্য- হয়ে যায় এবং পুরুষ তার পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে।" (পাকিস্তান টাইম, ২১-৯-৫৯ঃ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

আজকাল জন্মনিরোধ বটিকার (Contraceptive Pill) মহাত্ম্য খুব প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু এর ক্ষতিকর শক্তিও কারো অজানা নয় এবং একে ক্ষতিকর নয় বলে প্রচার করা, তথ্য সম্পর্কে ধোঁকাবাজি মাত্র। মেক্কার মুকের ভাষায় বিষয়টি নিম্নরূপঃ

"যদিও এখানে জন্মনিরোধ বটী সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সঠিক মতামত প্রদানের সময় হয় নি, তবুও এ কথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা দরকার যে, এটা অব্যর্থ ও সফল হতেই পারে না। এছাড়া পরবর্তীকালে নারীদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়ার খুবই আশংকা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ তার মাসিক ঋতু (Menstrual Cycle) অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নারীদের এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থির ব্যবস্থাপনায় রদবদল ঘটানোর পর কোন অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দেবে না, এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে?"

---

৬০. Folsome Clair, E, "Progress in the Search of Methods of Family Limitation Suitable for Agrarian Societies" in Approaches to Problems of Hihg Fertility in Agarian Societies" Milbank Memorial Fund, New York, 1952, P -130. "We have no known, harmless., simple or lowcost method to-day with which we can apply fertility control."

৬১. মেক্কার মুকের উল্লিখিত পুস্তক – ৭৪ পৃষ্ঠা

এসব বটী সম্পর্কে বৃটিশ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব মেডিক্যাল প্রাক্টীসের পরিশিষ্ট থেকে আরও একটি প্রমাণিক তথ্য পাওয়া যায়। ডাঃ জি. আই. সাইয়ার (G.I. Swyer) মন্তব্য করেন যেঃ

"এ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাবের আশংকা কিছুতেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এ ব্যবস্থার সব চাইতে বড় ত্রুটি এই যে, কুড়িটি জন্মনিরোধ বটী প্রতি মাসে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করতে হয়। পরন্তু বটীগুলোর উচ্চ মূল্য এবং দেহে এর প্রতিকূল প্রভাব এ ধরনের প্রতিকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে দিয়েছে।"[৬২]

এক সাম্প্রাতিক খবরে জানা যায় যে, লন্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার রেনেল্ড ডিউকস্-এর মত অনুসারে জন্মনিরোধের উল্লিখিত বটীগুলো দেহের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। এর ফলে শুধু মাথা ঘোরা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ব্যথাই সৃষ্টি হয় না, উপরন্তু ক্যানসারের মত ধ্বংসাত্মক রোগের আক্রমণাশংকাও এতে পুরো মাত্রায় রয়েছে।[৬৩]

এসব তো হলো জন্মনিরোধ পদ্ধতির ক্ষতির বহর। কিন্তু এ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করার পরও এ দ্বারা জন্মনিরোধ সার্থক হবার কোন নিশ্চয়তা নেই। ইংলিশ কমিশন অন্ ষ্টেরিলাইজেশন (গর্ভনিরোধ কমিশণ) ইংলণ্ড-এর রিপোর্টের ভাষায়ঃ জন্ম নিরোধ উপকরণাদি উদ্বেগজনকভাবে অনিশ্চিত।' সুইডেনের ডাঃ এম. একব্যাল্ড (Dr. M. Ekbald) কৃত পরীক্ষায় জানা গেছে যে, ৪৭৯ জন মহিলার মধ্যে শতকরা ৩৮ জন জন্মনিরোধক উপকরণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়েছে।[৬৪] অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও সন্তান জন্মের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই।

---

৬২. আমেরিকায় এ ধরনের একটি বটীর দাম ৫০ সেন্ট অর্থাৎ প্রায় সোয়া দুই টাকা। আমাদের দেশে পৌছতে পৌছিতে এর মূল্য আরো কিছু বেশি হয়ে যাবে। এ বটীর ব্যবহারের দরুন প্রত্যেকটি নারীর জন্যে প্রতি বছর ১২০ ডলার বা ৫৪০ টাকা খরচ করতে হবে (করোনেট পত্রিকা ১৯৬০ অক্টোবর সংখ্যা, ১১পৃঃ)। পাকিস্তানে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ২৫০ টাকা। এমতাবস্থায় এত দামী ঔষধ কয়জন ব্যবহার করতে পারে? পাকিস্তানের মোট নারী সমাজ থেকে অন্তত ৫০ লাখ বাছাই করে নিয়ে এ বটি ব্যবহার করালে এখানে আমাদের বার্ষিক খরচ করতে হবে ২ অর্বুদ ৭০ কোটি টাকা।

৬৩. Swyer, Dr. G. L. "Contraception. (1) Pshycogy Ovulation with Special Reference to Oral contraception" in Britih Encyclopedia of Medical Practice. Interim Supplement, July. 1959, P.-2/

৬৪. Ekbald, Martin. "Induced Abortion on Psychic Grounds, Stockholm, 1955, PP. 18, 19, 99-102.

এসব ক্ষতি ছাড়া অপর একটি বড় ক্ষতির দিক হচ্ছে এই যে, জন্মনিরোধক পন্থা অবলম্বন করে গর্ভনিরোধ সম্পর্কে অবগত হবার পর যৌন-আকাঙ্খা সীমানা লংঘন করে অগ্রসর হতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌনদাবি সংযমের সংগত সীমা-ডিঙিয়ে বেড়ে যেতে থাকে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু একটা পাশব সম্পর্ক বাকী থেকে যায়। এতে শুধু যৌন- প্রেরণা ছাড়া আর কিছু থাকে না। এ অবস্থা স্বাস্থ্য ও চরিত্র উভয়েরই জন্যে ক্ষতিকর। ডাঃ ফোরষ্টার লিখেনঃ

পুরুষের স্বামীত্বের গতিধারা যদি নিছক যৌন লালসা তৃপ্ত করার পথে ধাবিত হয় এবং এক আয়ত্তে রাখার যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এর অপবিত্রতা, পাশবিকতা ও বিষতুল্য ক্ষতির পরিমাণ অগণিত সন্তান জন্মানোর চেয়েও অধিকতর ক্ষতিকর হবে।

দুইঃ সামাজিক ক্ষতি

জন্মনিরোধ ব্যবস্থার ফলে পারিবারিক জীবনে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা প্রসঙ্গক্রমে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এর যে প্রভাব সকলের আগে পড়ে তা হচ্ছে এই যে, দেহের স্বাভাবিক চাহিদা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে না পারার দরুন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মধ্যে অনাত্মীয়তা সৃষ্টি হতে থাকে এবং তা ক্রমশ পারস্পরিক সদ্ভাব ও ভালবাসা হ্রাস, নিরাসক্তি ও অবশেষে ঘৃণা, অসন্তোষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে, বিশেষত এসব উপকরণ ব্যবহারের ফলে নারীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে বৈকল্য দেখা দেয়া এবং তার মেজাজ দিন দিন যেভাবে রুক্ষ হয়ে ওঠে, তাতে দাম্পত্য জীবনের সকল সুখ-শান্তি বিদায় নেয়।

এসব ছাড়া আরও একটি বৃহত্তর ক্ষতিও সাধিত হয়, আর সেটি বস্তুতান্ত্রিক উপকরণের চেয়ে আত্মিক উপকরণের দরুনই অধিকতর প্রকাশ পায়। দৈহিক দিন থেকে তো স্বামী ও স্ত্রীর সর্ম্পক একটি জৈবিক সর্ম্পক থাকে। কিন্তু এ সম্পর্ককে একটি উচ্চস্তরের আত্মিক সম্পর্কে রূপান্তরিত করার প্রধান উপকরণ হচ্ছে সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মিলিত দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্যে পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতা থাকে, তাই উভয়ের মধ্যে গভীর সদ্ভাব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ এ গভীর আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির পথে বাধা দান করে। এর অপরিহার্য ফলস্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন দায়িত্ববোধ ও শক্তিশালী বন্ধন স্থাপিত হয় না এবং এদের সম্পর্ক জৈবিক সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠতেই পারে না। এ জৈবিক সম্পর্কের ফলে কিছুকাল যাবৎ একে অপরকে ভোগ করার পর উভয়ের

সম্ভোগস্পৃহা দমে যায়। আবার এ নিছক পাশবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নর-নারী প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে সমান। এমতাবস্থায় নিছক জৈবিক ক্ষুধা পূরণ করার জন্যে কোন নির্দিষ্ট নারী-পুরুষের পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। সন্তানই স্বামী-স্ত্রীকে চিরদিন একত্রে থাকতে বাধ্য করে। সে সন্তানই যদি না থাকে তাহলে উভয়ের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্যেই ইউরোপ ও আমেরিকায় দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং জন্মনিরোধ আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে তালাকের সংখ্যা দিন দিন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, বরং সেখানে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

তিনঃ নৈতিক ক্ষতি

নানাবিধ কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণ চরিত্রের ক্ষতি সাধন করে থাকেঃ

(১) জন্মনিয়ন্ত্রণ নর-নারী ব্যভিচারের অবাধ সনদ দিয়ে দেয়। কেননা জারজ সন্তান পয়দা হয়ে দুর্ণাম রটনা বা সামাজিক লাঞ্ছনার ভয় আর থাকে না। এজন্যে উভয় পক্ষই অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ পেয়ে থাকে।[৬৫]

(২) ভোগ-লালসা ও আত্মপূজা সীমাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায় এবং চারিত্রিক রোগ মহামারীর মত বিস্তার লাভ করে।

(৩) যেসব দম্পতির সন্তান জন্মায় না, তাদের চরিত্রে অনেকগুলো গুণ সৃষ্টি হতে পারে না- যেগুলো শুধু সন্তান লালন-পালনের মধ্য দিয়েই সম্ভব। সন্তান লালন-পালনের মাধ্যমে মাতা-পিতার মনে ভালবাসা, ত্যাগ ও কোরবানীর মনোভাব জন্ম নেয়। পরিণাম চিন্তা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের গুণাবলী ও এ ব্যবস্থাতেই বিকাশ লাভ করে। সন্তানের দরুন মাতা-পিতা সরল সামাজিক জীবন যাপন করতে এবং শুধু নিজেরই আরাম- আয়েসের চেষ্টায় স্বার্থান্ধ না হতে বাধ্য হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ এসব চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহতায়ালা নিজের সৃষ্টি ও প্রতিপালন কার্যের এক অংশ মানুষের নিকট অর্পণ করেন এবং এভাবেই মানুষের জন্যে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার সুযোগ ঘটে। জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুসারী হলে মানুষ এত বড় উচ্চ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

---

৬৫. ডঃ ওয়েষ্টার মার্ক (Dr. Wester Marck) তার বিখ্যাত Future of Marriage in Western Civillazation (পাশ্চাত্য সভতায় বিয়ের ভবিষ্যৎ) গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেন, "গর্ভনিরোধবিদ্যা বিয়ের হার বাড়াতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এও একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, এদ্বারা বিয়ের বন্ধন ছাড়া নর-নারী মিলনের (Extra Matrimonial Intercourse) পথও অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে আমাদের জামানায়ই বিয়ে সম্পর্কে সংকীর্ণ ও অন্ধকার ভবিষ্যতের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।"

(৪) জন্মনিরোধের দরুন শিশুদের নৈতিক শিক্ষাও অপূর্ণ থেকে যায়। যে শিশু ছোট ও বড় ভাইবোনদের সঙ্গে চলাফেরা ও খেলাধুলা করার সুযোগ পায় না তার অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করার অবকাশ ঘটে না। শুধু মাতাপিতাই শিশুদের চরিত্র গঠন করে না বরং এরা নিজেরাও পরস্পরের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে থাকে। এদের একত্রে থাকা ও মেলামেশা, ভালবাসা, ত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতা ইত্যাদি ধরনের অনেক গুণাবলী সৃষ্টির সহায়ক হয় এবং পরস্পরের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে অনেক নৈতিক দুর্বলতা দূর করে দেয়। যারা একটি শিশু বা দু'টি শিশু জন্মানো পর্যন্ত নিজেদের সন্তান সংখ্যা সীমিত করে দেয় তাদের সন্তানকে উত্তম নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৬৬]

চারঃ বংশগত ও জাতীয় ক্ষতি

এযাবৎ শুধু ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণকারীদের যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা বলা হলো। এখন এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বংশ ও জাতি কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করা যাক।

(ক) **নেতৃত্বের অভাবঃ** মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহতায়ালা যে মহন ব্যবস্থা কয়েম রেখেছেন, তাতে পুরুষের দায়িত্ব শুধু নারীদেহে নিজের বীর্য পৌছিয়ে দেয়া। এরপর আর কিছু মানুষের আয়ত্বাধীন থাকে না। সব কিছুই আল্লাহ কৌশল সমোপযোগিতা ও ইচ্ছার অধীন। পুরুষ যতবার নারীর সঙ্গে মিলিত হয়, ততবারই তার দেহ থেকে নারীদেহে যে পরিমান শুক্রকীট প্রবেশ করে তার সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ কোটি। এ কীটগুলো নারীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করার জন্যে প্রযোগিতা শুরু করে দেয়। এদের প্রতিটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুর্বল মস্তিষ্ক ও নির্বোধ যেমন থাকে, তেমনি বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞজনও থাকে। এগুলোর মধ্যে এরিষ্টটল, ইবনে সীনা, চিঙ্গীজ, নেপোলিয়ন, স্যাকসপিয়র, হাফেজ, মীরজাফর, মীরসাদেক এবং নিষ্ঠা ও সত্যতার প্রতিমূর্তি সবই বিদ্যামান থাকে। এদের মধ্য থেকে বিশেষ

---

৬৬. শুধু তাই নয় 'মনস্তত্ব বিশেষজ্ঞদের একদল তো এ কথাও বলেন যে, এর ফলে শিশুদের মন মগজের সুষ্ঠু বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয় এবং দুটি শিশুর বয়সের পার্থক্য বেশি হলে নিকটস্থ ছোট শিশু না থাকার দরুন বড় শিশুটির মস্তিষ্কে (Neurosisi) অনেক ক্ষেত্রে রোগও সৃষ্টি হয়। দেখুন, David M. Levy-র গ্রন্থ Matemal Over Protection, নিউইয়র্ক ১৯৪৩।

প্রফেসার আর্ণল্ড গ্রেন এ বিষয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত প্রসঙ্গে বলেন, শিশুদের নিকটস্থ বয়সের সঙ্গী না থাকা অন্য অনেক দোষের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের অনেক অসুবিধায় ফেলে দেয় এবং চীৎকার ও গোলমাল জাতীয় ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়। দেখুন, The Middle Class Male Child and Neurosis-by Amold Green S A Modern Introduction to Family- রচনা–নার্মন বেইল ও আজরা দ্যগল, প্রকাশ লণ্ডন ১৯৬১, ৫৬৮ পৃঃ।

ধরনের শুক্রকীট বাছাই করে বিশিষ্ট ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এক বিশাল ধরনের মানব-শিশু পয়দা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এখানে শুধু আল্লাহতায়ালার মনোনয়নই কাজ করে এবং কোন সময় জাতির মধ্যে কোন ধরনের লোক পাঠাতে হ'বে, এটাও তিনি ফয়সালা করে থাকেন। মানুষ তার কার্যকলাপের পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমতাবস্থায় যদি সে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে, তাহলে এর পরিণতি অন্ধকারে লাঠি ঘুরানোর মতই হতে বাধ্য। অন্ধকারে লাঠি ঘুরানোর ফলে সাপ, বিচ্ছু মরবে কি অপর কারো মাথা ফাটবে অথবা কোন মূল্যবান বস্তু নষ্ট হয়ে যাবে তা জানার উপায় নেই। জন্মনিরোধকারী মানুষ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে হয়তো বা তার জাতির একজন বিচক্ষণ সেনাপতির জন্ম বন্ধ করার কারণ হতে পারে এবং নিজের সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সাজাস্বরূপ জাতির মধ্যে নির্বোধ, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতকের জন্ম হতে থাকাও বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা সাধারণ্যে চালু হ'বার পর তো নেতৃত্ব দানকারী জনশক্তির অভাব সৃষ্টি হওয়া সুনিশ্চিত।

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক জনশক্তিসম্পন্ন পরিবারই অধিকতর সাফল্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে জনশক্তির দিক থেকে ছোট পরিবারকে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থতার সম্মুখীন হ'তে দেখা গেছে। অধ্যাপক ক্লার্ক লিখেছেনঃ

যদিও একটি বড় পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা নিঃসন্দেহে ব্যয় সাপেক্ষ, তবুও একটি নতুন শিশুর জন্মদান করে মাতাপিতা পূর্ববর্তী সন্তানদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে বলে অভিযোগ করা নেহায়েত ভুল। মনে হচ্ছে অনেক গবেষণার পর ফ্রান্সের মিঃ ব্রেসার্ড যা উপলব্ধি করেছেন আধুনিক মাতাপিতাগণ তা বুঝতে শুরু করেছেন। উল্লিখিত তথ্যবিদ, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর পেশাধারী অধিক সংখ্যক সন্তানসম্পন্ন পরিবারগুলোর গতি- প্রকৃতি, জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং যে সব পরিবারে সন্তান সংখ্যা কম তাদের সঙ্গে তুলনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, অধিক সংখ্যক সন্তানসম্পন্ন পরিবারে যাদের জন্ম তার কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদনকারী পরিবাররের লোকদের তুলনায় জীবনের কর্মক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে থাকে। [৬৭]

(খ) ব্যক্তি স্বার্থের বেদী মূলে জাতীয় স্বার্থের কোরবাণী

জন্মনিরোধ আন্দোলনে সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থা, বাসনা ও প্রয়োজন অনুসারে কি পরিমাণ সন্তান জন্মাবে অথবা মোটেই সন্তান জন্মানো উচিত

---

৬৭. দৈনিক লন্ডন টাইমস-এর ১৫ ই মার্চ ১৯৫৯ সংখ্যায় Too small Families (অতি ক্ষুদ্র পরিবারগুলো) শীর্ষক প্রবন্ধ।

কি না এ বিষয়ে ফয়সালা করে থাকে। এ ফয়সালা করার সময় জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক শিশু দরকার তা হিসাব করা হয় না। এ বিষয়ে সঠিক ফয়সালা করা ব্যক্তি বিশেষের সাধ্য সীমা বর্হির্ভূত। এছাড়া ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। ফলে নতুন শিশুর জন্ম পুরোপুরি ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর হয়ে পড়ে এবং জন্মহার এত দ্রুত কমে যেতে শুরু করে যে, কোন একবিশেষ পর্যায়ে তাকে বাধা দান করার কোন শক্তিই জাতির হাতে থাকে না। যদি ব্যক্তির স্বার্থপরতা বাড়তে থাকে এবং জন্মনিরোধের অনিবার্য কুফলগুলোও অব্যাহত গতিতে প্রসার লাভ করে চলে তা হলে ব্যক্তিস্বার্থের কোরবানীগাহে যে জাতীয় স্বার্থকে জবাই করা হবে, তাতে তার সন্দেহ কি? এমন কি একদিন ঐ জাতির অস্তিত্বই মিটে যেতে পারে।

(গ) জাতীয় আত্মহত্যা

জন্মনিরোধ প্রবর্তনের ফলে যে জাতির জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে সে জাতি সর্বদা ধ্বংসের প্রতীক্ষায় থাকে। মহামারী বা বড় ধরনের কোনো যুদ্ধে যদি বেশী সংখ্যক লোক মারা যায় তাহলে জাতি শুধু মানুষের অভাবেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। কারণ নিহত লোকদের স্থান পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় জনবল তখনি উৎপন্ন করার কোন উপায় জাতির হাতে থাকে না।[৬৮] এরই দরুন দু'হাজার বছর পূর্বে গ্রীক জাতি ধ্বংস হয়েছিলো গ্রীক দেশে গর্ভপাত ও সন্তান হত্যার প্রথা এতটা বিস্তারলাভ করেছিলো যে, এর ফলে জনসংখ্যা কমে যেতে শুরু হয়েছিলো। ঐ সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যায় এবং এতেও অনেক লোক মারা যায়। এ উভয় পথে জনসংখ্যা এতটা কমে গেলো যে, গ্রীক জাতি তার টাল সামলাতে পারলো না। অবশেষে তাকে নিজের ঘরেই গোলামীর জীবন যাপন করতে হয় আজকের পাশ্চাত্যো জগৎ ঠিক এই ধরনের বিপদকেই ঘরে ডেকে এনেছে। সম্ভবত আত্মহত্যার মাধ্যমে এ জাতিকে বরবাদ করে দেয়া আল্লাহরই ইচ্ছা। কিন্তু আমরা কেন অন্যের দেখাদেখি নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবো?

পাঁচঃ আর্থিক ক্ষতি

জন্মনিরোধ প্রথা আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হবে- এ ধারণা অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের এ ধারণা

---

৬৮. হাল জামানায় আণবিক অস্ত্র এ আশংকো আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। হিরোশিমায় যে আণবিক বোমা নিকে করে হয়েছিল, তার শক্তি ছিল ২০ হাজার টন টি এন টি। এতে জাপানের ৭৮,১৫০ জন লোক মারা যায়, ৩,৭৪২৫০ জন আহত এবং ১৩,০৮৩ জন নিখোঁজ হয়। আজকাল দশ কোটি টি, এন, টি শক্তি বিশিষ্ট বোমা তৈরি হচ্ছে। আর এ বোমা হিরোমিশায় নিক্ষিপ্ত বোমার তুলনায় পাঁচ হাজার গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন।

দিন দিন বেড়ে চলেছে যে, জনসংখ্যার হ্রাস প্রাপ্তি অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ। এটা এজন্যে হয় যে, উৎপাদনকারী জন সংখ্যার (Producing Population) তুলনায় ব্যবহারকারী জনসংখ্যা (Consuming Popuation) কমে যায় এবং এর অপরিহার্য পরিণতিস্বরূপ উৎপাদনকারী জনসংখ্যার মধ্যে বেকারত্ব বিস্তার লাভ করতে থাকে। উৎপাদনকারী জনসংখ্যা শুধু যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে ব্যবহারকারী জনসংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু ও অক্ষম লোকও শামিল থাকে। উৎপাদনে এদের কোনই অংশ থাকে না। যদি এদের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহলে সামগ্রিকভাবে সম্পদ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সম্পদের খরিদ্দার কমে গেলে সে অনুপাতে সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনকারী উভয়ই কমে যেতে বাধ্য হবে। এজন্যেই জার্মানী ও ইটালীর অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের এক প্রভাবশালী দল জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

সম্প্রতি বৃটেন ও আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞও এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে লর্ড কেনীস (Lord Keynes), প্রফেসার হানসান (Alvin H. Hansen), প্রফেসার কলিন ক্লার্ক প্রসেফার জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H Colde) – এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেনীস হানসান গ্রুপের মতামত সম্পর্কে প্রফেসার জোশেফ স্পেংলার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেনঃ

"বুঝা গেলো যে, জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে (Upsurge) শুরু করলে সমাজের অর্থনৈতিক তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। যে সময় সম্প্রসারণকারী শক্তি গুণী (Expansive) সংকোচনকারী শক্তিগুলী (Contractive Forces) তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয় তখন অর্থনেতিক তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। পরন্তু পর বিপরীত অবস্থায়ও অনুরূপ ফল ফলবে। মনে হচ্ছে যে, কেনীস হানসান্ কর্তৃক পেশকৃত বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ জনসংখ্যা হ্রাসজনিত যুক্তিমালা (Thesis) দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর কারণ হচ্ছে, এই যে, জন্মহার ধারাবাহিকভাবে[৬৯] কমে যাওয়ার ফলে একদিকে পুঁজি বিনিয়োগের (Investment) প্রয়োজন হ্রাস পায়; কারণ বাড়তি জনসংখ্যার দরুনই পুঁজি বিনিয়োগ ব্যবস্থা উন্নত হয়। অপর দিকে এ ব্যবস্থার ফলে জনশক্তিকে পূর্নরূপে কাজে নিয়োগ (Full Employment) সম্পর্কিত বহুবিধ পুঁজি বিনিয়োগ তৎপরতায় বাধার সৃষ্টি হয়।"[৭০]

---

৬৯. মূল শব্দটি হচ্ছে Tapering যদ্বারা বোঝা যায় যে, কোন বস্তু ওপরের দিকে সম্প্রসারিত এবং নিম্নদিকে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে নিম্ন বিন্দুতে পৌছে– যথা একটা উলটা ত্রিভুজ।

৭০. Spengler Joshefh. J: 'Population Theory': A Survey of Contemporary Economics Vol. II: Illinols' 1952p-116

কলিন ক্লার্ক লিখেছেনঃ

"বর্তমান সমাজে অধিক শিল্প সম্ভবত জনসংখ্যা দ্বারাই উপকৃত হবে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো এমনভাবে কাজ করছে যে, যদি জনসংখ্যা বেড়ে যায় এবং বাজার সম্প্রসারিত হয় তাহলে সংস্থা অধিকতর ভালভাবে চলতে পারবে এবং মাথা পিছু আয় বাড়বে বই কমবে না। যদি উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ ঘনবসতিপূর্ণ না হ'তো তাহলে আধুনিক শিল্পগুলো অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতো এবং উৎপাদন খরচ অনেক বেশী পড়তো। এমন কি এসব শিল্পে উক্ত অবস্থায় গড়ে ওঠতে পারতো কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব প্রামাণ্য বিবরণ পূর্বে পেশ করা হয়েছে তাকে কোরআন মজিদের নিম্নলিখিত আয়াতের আংশকি তফসীর বলা চলেঃ

"যারা অজ্ঞতাবশত ভালমন্দ বিবেচনা ব্যতীতই সন্তানদের ধ্বংসে করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র দানকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।"

এছাড়া সেই আয়াতের ব্যাখ্যাও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়, যাতে বলা হয়েছেঃ

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ـ

"আর যখন যে হাতে পায়, তখন আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ফল-শস্য ও সন্তান- সন্ততি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে।" আল-বাকারাহ্‌ ২-৫

পূর্বোক্ত আলোচনা স্মরণ করলেই বুঝতেই পারা যাবে যে, আল্লাহ তায়ালা ফল শস্য ও সন্তান ধ্বংসকে কি জন্যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ আলোচনা নিম্নবর্ণিত আয়াতের মর্ম স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে।

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا – بنى اسرائيل : ٣١ ـ

"তোমরা অভাবের আশংকায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমরা তাদের ও তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিসন্দেহে মহাপরাধ।"

এ আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, অর্থনৈতিক সংকটের দরুন সন্তান সংখ্যা হ্রাস করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

এরপর আমি জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের সপক্ষে যেসব হাদীস পেশ করা হয় তারও সঠিক অর্থ বর্ণনা করবো।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় তাদের অনেকগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্ট অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকদের মতে সামাজিক অবস্থার বর্তমান ধারা সভ্যতার প্রচলিত ধরন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্তমান মূলনীতি পরিবর্তনযোগ্য নয়। অবশ্য এগুলোর দরুন যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান আবশ্যক, আর সমাধানের একমাত্র সহজ ও সরল পথই হচ্ছে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যেসব সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হচ্ছে ইসলামের সাংস্কৃতিক নীতি এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে ইসলামী আইন জারী করে সে সব সমস্যারই মুল্যোৎপাটন করে দেয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে আগের আলোচনায় যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আমি শুধু ঐ সব যুক্তি নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলো বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করার পরিবর্তে মানুষের সাধারণ অবস্থার ওপর নজর রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক গণ তাদের পুস্তক–পুস্তিকা ও বক্তৃতাবলীতে আবৃত্তি করে থাকে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থকদের যুক্তি ও তার জবাব

(ক) অর্থনৈতিক উপকরণাদির অভাব আশংকা ঃ

মানুষকে যে যুক্তি সব চাইতে বেশি ধোঁকা দিয়েছে তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

'দুনিয়াতে বাসোপযোগী স্থান সীমাবদ্ধ। মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদিও সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানব জাতির বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা সীমাহীন। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় তিনশত কোটির কাছাকাছি। অনুকূল পরিবেশ অব্যাহত থাকলে পরবর্তী ৩০ বছরে এ সংখ্যা দ্বিগুন হ'বার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই সংগতভাবেই এ আশংকা করা যেতে পারে যে, ৫০ বছরের মধ্যে দুনিয়া জন মানবে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বংশধরগণ জীন যাত্রার মান নিম্নগামী করতে বাধ্য হবে। এমনকি তাদের পক্ষে সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপনও দুঃসাধ্য হযে পড়বে। তাই মানবতাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে জন্মহার সীমিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সংগত সীমারেখায় রাখা অত্যন্ত জরুরী।"

এটা আসলে খোদার ব্যবস্থাপনার সমালোচনা। যে বিষয়টা হিসেবের মাধ্যমে এসব লোক এত সহজে জানতে পেরেছে, সে বিষয়টি সম্পর্কে খোদার কোন কিছু জানা নেই বলে এদের ধারণা। এরা মনে করে যে, দুনিয়ায় কত সংখ্যক জীবের সংস্থান সম্ভব, এখানে কত সংখ্যক লোকের জন্ম হওয়া উচিত এ বিষয়ে খোদার কোন হিসেব নাই।

يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية –

""এরা অন্যায় ভাবে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার ধারণা পোষণ করে।" (কোরআন)

এদের জানা নেই যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ পরিকল্পনাসহ সৃষ্টি করেছেন।

انا كل شيى خلقنه بقدر

"নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে হিসেব মতে সৃষ্টি করে থাকি' (কোরআন) তার ভান্ডার থেকে যা কিছু বের হয়ে আসে তা পরিমাণ মতেই এসে থাকে।

وَاِن مِّن شَيٍ اِلاَّ عِندَنَا خَذَائِنُه وَمَا نُنَزِّلُه اِلاَّ بِقَدرٍ مَّعلُومٍ –

"এমন কোন জীব নেই যার জীবন ধারণোপযোগী সরঞ্জামাদি আমার কাছে নেই–এবং একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যতীত আমি কোন কিছুই প্রেরণ করি না। (কোরআন)

এদের ধারণা যা-ই হোক না কেন, ব্যাপর এই যে, এ বিশাল জগতের স্রষ্টা সৃষ্টি শিল্পে অদক্ষ নন।

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ —"আমি সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নই।"
(আল কোরআন)

যদি এরা স্রষ্টার কার্যকৌশল গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতো এবং তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতো তাহলে এদের নিকট এটা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়তো যে, তাঁর হিসাব ও পরিকল্পনা আশ্চর্যজনক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি এ সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জীব সৃষ্টি করেছেন। এদের প্রতিটির মধ্যে এত বিপুল প্রজনন শক্তি রয়েছে যে, যদি মাত্র কোন এক ধরনের জীব বা বিশেষ বিশেষ জীনের মাত্র একটি জোড়ার বংশকে তার জন্মগত শক্তি অনুসারে বাড়তে দেয়া হয় তাহলে অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র দুনিয়অ শুধু ঐ ধরনের জীব দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যাবে। অন্য কোন জীবের জন্যে সেখানে এক বিন্দু স্থানও থাকা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা উদ্ভিদের মধ্যে (Sisymbrium Sophia)-র (সিসিমব্রীয়াম সোফিয়া) বংশ বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করতে পারি। এ জাতীর প্রতিটি চারা গাছে সাধারণত সাড়ে সাত লাখ বীজ হয়। যদি এসব বীজ জমিতে পড়ে অঙ্কুর হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত এদের বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে তাহলে দুনিয়াতে অন্য কোন বস্তুর জন্যে এক কড়া জমিনও অবশিষ্ট থাকবে না। Star Fish বা তারা মাছ একবারে ২০ কোটি ডিম প্রসব করে। যদি এ জাতীয় মাছের মাত্র একটির বংশ বাড়তে দেয়া হয় তাহলে অধস্তন তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে পৌছতে পৌছতে সারা দুনিয়ার পানি শুধু ঐ মাছেই পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এক ফোটা পানি ও অতিরিক্ত দেখা যাবে না। বেশী দুরে যাবার দরকার কি! একবার মানুষের প্রজনন শক্তিটাই দেখা যাক না। একটি পুরুষের দেহ থেকে এক সময়ে যে বীর্য নিগত হয় তা দ্বারা ৩০/৪০ কোটি নারী গর্ভবতী হতে পারে। যদি একজন মাত্র পুরুষকে তার পূর্ণ প্রজনন শক্তি অনুসারে বংশ বাড়াবার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তির বংশই সমগ্র দুনিয়া দখল করে ফেলবে এবং তিল পরিমাণ স্থানও বাকি থাকবে না। কিন্তু যিনি অসংখ্য জীবকে বিপুল প্রজনন শক্তিসহ সৃষ্টি করেন এবং কোন একটিকেও নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করতে দেন না, তিনি কে? এটা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা না স্রষ্টার হিকমত? বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জীবিত জীব কোষের বৃদ্ধি সম্প্রসারণ ক্ষমতা সীমাহীন। এমন কি Uni Cellular Organism নামীয় কোষে সম্প্রসারণ শক্তি এত প্রবল যে, রীতিমত এর খাদ্য সববরাহ এবং এর নিজকে পুনঃ পুনঃ বিভক্ত করার সুযোগ অব্যাহত থাকলে পাঁচ বছরের মধ্য এত পরিমাণ জীবকোষের সৃষ্টি

হতে পারে যে, এদের মিলিত আয়তন পৃথিবীর চাইতে দশ হাজার গুণ বড় হয়ে যাবে। কিন্তু কে এই বিপুল জীবনী শক্তির ওপর কন্ট্রোলার নিযুক্ত করে রেখেছেন? যিনি এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন ধরনের জীব এক নির্ধারিত পরিমাণ মাফিক বের করেছেন, তিনি কে?

যদি মানুষ স্রষ্টার এসব নিদর্শনের প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে কখনো তার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হবে না। মানুষ সৃষ্ট জগত, এমন কি তার দেহে যেসব নিদর্শন আছে সেগুলো সম্পর্কে কোন চিন্তা গবেষণা করে না বলেই তাদের মনে এসব অজ্ঞতাজনিত ধারণা জন্মায়। মানুষের প্রচেষ্টার শেষ সীমা কোথায় এবং কোন্ সীমান্ত রেখা থেকে আল্লাহর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা শুরু হয়ে যায় তা এরা আজও বুঝতে পারে নি। আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা একে বুঝে ওঠাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের সাধ্য সীমা ডিঙিয়ে গিয়ে মানুষ যখন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তখন আল্লাহর হিকমতের কোন পরিবর্তন তো সম্ভব হয় না, তবে মানুষ নিজের মগজে অনেক জটিলতা নিজের চিন্তাধারায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ফেলে। তারা বসে বসে হিসেব করে যে, দশ বছরের মধ্যে জন সংখ্যা দেড় কোটি বেড়ে গিয়েছে এবং পরবর্তী দশ বছরে আরও দু'কোটি বাড়বে। এভাবেই তারা বলে যে, ২০ বছরে তো জন সংখ্যা ১৬ কোটিতে পরিণত হবে এবং ১০০ বছরে চার গুণ হয়ে যাবে। তার পর এত লোক কোথায় সংকুলান হবে, কি খাবে, কিভাবে বাঁচবে–এসব ভেবে তারা শংকিত হয়ে পড়ে। এ চিন্তায়ই তারা বিভ্রান্ত হয়–এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বক্তৃতা করে–কমিটি গঠন করে এবং জাতির বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মনোযোগ আর্কষণ করে সমস্যার গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্র এ বান্দারা কখনো চিন্তা করে না যে, হাজার হাজার বছর পর্যন্ত মানুষকে যে আল্লাহ পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনিই যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন এবং তিনি যদি মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চান তাহলে দেবেন। জনসংখ্যা বাড়ানো, কমানো এবং পৃথিবীতে এদের সংকুলান করানোর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালারঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ– هود : ٦

"পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার রেজেকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেন নি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ অবস্থিতির স্থান অবগত আছেন। এ সবই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লেখা আছে।" আল–কুরআন–১১ঃ৬।

এসব ব্যবস্থাপনা আমাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টির অগম্য কোন গোপন স্থান থেকে পরিচালিত হচ্ছে। আঠারো শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের জন সংখ্যা এত দ্রুত বেড়ে যায় যে, সে দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিপুল জনসংখ্যার সংকুলান ও খাদ্য ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব দেখতে পেয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের জন সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগতি রেখে রেজেকের উপায় উপাদানও বাড়তে থাকে এবং ইংরেজ জাতির সম্প্রসারণের জন্যে দুনিয়ার বড় বড় ভূখণ্ড তাদের হস্তগত হতে থাকে।

(২) দুনিয়ার অর্থনৈতিক উপকরণ ও জনসংখ্যা

বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার উইলিয়াম কুক্স ১৮৯৮ সালে সভ্য জগতকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড ও অবশিষ্ট সভ্যজগত শোচনীয় খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, দুনিয়ার খাদ্য উপকরণ মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ত্রিশ বছর পর খাদ্য সম্পর্কে কোন বিপর্যয় তো দেখা গেলই না, উপরন্তু খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে, বাজারে প্রাচুর্যের দরুন খাদ্য চাহিদা মন্দা হয়ে গেল এবং আর্জেন্টিনা ও আমেরিকা অতিরিক্ত খাদ্য সম্ভার সাগরে নিক্ষেপ করতে বাধ্য হলো।

মানুষ তার সংকীর্ণ দৃষ্টির দরুন বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু প্রতিবারই বাস্তব অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং স্রষ্টা উপকরণ বৃদ্ধির যেসব পন্থা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। আজকের দুনিয়ায়ও খাদ্য সংকটের আশংকায় যে হাঁক ডাক শুরু হয়েছে, তার মূলে কতখানি সত্য নিহিত আছে তা এবার বিচার করে দেখা যাক।

১. সর্বপ্রথম পৃথিবীতে বাসস্থান সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ হচ্ছে ৫ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৮ হাজার বর্গমাইল। আর এর অধিবাসীদের সংখ্যা হচ্ছে (১৯৫৯ সালের হিসাব মুতাবিক) ২ অর্বুদ ৮৫ কোটি। এ হিসাব অনুসারে প্রতি বর্গমাইলের লোক বসতি (Derite) হচ্ছে ৫৪ জন এবং অধ্যাপক ডাডলে ষ্ট্যাম্প-এর হিসেব অনুসারে পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য গড়ে ১২$\frac{১}{২}$ একর জমি আছে।[৭২]

দুনিয়ায় কতলোক বসবাস করতে পারে এ সম্পর্কে কোন ধারণা করতে হলে

৭২. Stamp, Dudly, "Our Developing World", London, 1960 Page-39.

জানা দরকার যে, বর্তমানে এক বর্গমাইল পরিমিত স্থানে হল্যাণ্ডে প্রায় ১.০০০, ইংল্যণ্ডে ১.৮৫২ ও নিউইয়র্কে ২২,০০০ লোক স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে। দুনিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই বহু জমি অতিরিক্ত ও অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। চীনে মোট জমির শতকরা ১০ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে। পশ্চিম আফ্রিকায় ব্যবহারযোগ্য জমির শতকরা ৬২ ভাগ (প্রায় ১ অর্বুদ ১৫ কোটি একর) অকেজো অবস্থায় রয়েছে।[৭৩] ব্রাজিল ২ অর্বুদ একর জমির মাত্র শতকরা ২.২৫ ভাগ জমিতে চাষাবাদ করছে আর ক্যানাডা ২ অর্বুদ ৩১ কোটি একর জমির মধ্য থেকে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ জমিতে চাষাবাদ করে থাকে।[৭৪] এমতাবস্থায় জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে বাস্তবের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করা।

পুনরায় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের লোক বসতির সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখনও উন্নয়নের অনেক ক্ষেত্র শূন্য পড়ে আছে। কয়েকটি বিশিষ্ট অঞ্চলের লোক বসতির হার নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

দেশের নাম	প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বসতি[৭]
হল্যাণ্ড	৩৫৪
বেলজিয়াম	২৯৭
ইংল্যাণ্ড	২১৩
জার্মানী	২১০
পাকিস্তান	৯১
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	২৩
আমেরিকা	১৯
ইরান	১২
দক্ষিণ আফ্রিকা	১২
নিউঢজল্যোণ্ড	৮
অষ্ট্রেলিয়া	১

৭৩. Meormack, People, Space, food.pp. 20.21.
৭৪. Britannica Book of the Year 1958, PP-387-8
৭৫. U. N. Demographic Year Book 1956, Table 1
ইউ.এন. ও.র হিসাব মাফিক প্রতি কিলোমিটারে যে লোক বসতি হয় একে $2\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ করে প্রতি বর্গমাইলের লোক বসতি পাওয়া যায়।

মহাদেশগুলোর লোক বসতি নিম্নরূপঃ

ইউরোপ	প্রতি	বর্গকিলোমিটারে	৮৫ জন
এশিয়া	"	"	৫৯ "
আমেরিকা	"	"	৯ "
আফ্রিকা	"	"	৮ "
ওসিয়ানা	"	"	২ "
সমগ্র দুনিয়া		গড়ে	২১ "

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীতে উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির এখনও বিপুল অবকাশ রয়েছে। বরং আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে তো জনসংখ্যার অভাবে উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।[৭৬]

উল্লিখিত জমি ছাড়াও বিপুল পরিমাণ মরুভূমি ও কর্দমাক্ত জমি রয়েছে এবং এগুলোকে বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্যে আবাদযোগ্য করা যেতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদীর অববাহিকায় (Amazan Basin) এত পরিমাণ জমি রয়েছে যা ব্যবহারযোগ করার পর ইউরোপের সকল বাসিন্দার জন্যে সেখানে বসবাস করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে পার্কার হানস Patker Hanson রচিত 'নিউ ওয়ার্ল্ড ইমারজেন্সী' (New Worlds Emergency) নামক পুস্তক খুবই তথ্যবহুল এবং এক নয়া বিশ্বের সন্ধান দেয়। পুনরায় রিচার্ড কালডার'স (Richer Calder) রচিত 'ম্যান এগেনষ্ট দি ডেজার্ট' (Man Against the Desert) নামক ও পুস্তক কতক নতুন সম্ভাবনার সন্ধান দেয়। এ পুস্তকে মরুভূমিকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করার পন্থা বাতলানো হয়েছে।[৭৭]

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে স্থানাভাব কোন সমস্যাই নয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়ার কোন আশংকা নেই। মানুষের সাহসের অভাব এবং কর্মবিমুখতাই শ্রম ও চেষ্টার পরিবর্তে বংশ হত্যার তালিম দেয়।

---

৭৬. ডাডলে ষ্ট্যাম্পের উপরোল্লিখিত পুস্তকের ৫২ পৃষ্টায় লেখকের ভাষায়–The Third Difficulty is the Lack of Population.

৭৭. ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের রিডার্স ডাইজেষ্ট–এ এড্উইন মুলার (Muller) লিখেছেন যে, পৃথিবীর বর্তমান জমিনের এক চতুর্থাংশ মরুভূমি। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানিকে ওপরে আনা যায় এবং সমুদ্রের লোনা পানিকে সুপেয় পানিতে পরিণত করার কোন স্বল্প ব্যয়সাধ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তাহলে সমগ্র মরুভূমি শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

চাষাবাদকৃত ও চাষাবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ

[মিলিয়ন (দশ লক্ষ) কিলোমিটার হিসাবে]

অঞ্চল	মোট জমি	বর্তমানে চাষাবাদ করা হয়		বিভিন্ন উপায়ে যা বাড়ানো যেতে পারে: বর্তমানে ব্যবহৃত উপকরণ অনুসারে		নতুন উপকরণ অনুসারে		ভবিষ্যতে যে উপকরণ বের হবে তা দ্বারা		মোট চাষ-যোগ্য জমি	
		জমির পরিমাণ	মোট জমির কত অংশ	জমির পরিমাণ	মোট জমির অংশ	জমির পরিমাণ	মোট জমির অংশ	জমির পরিমাণ	মোট জমির অংশ	পরিমাণ	মোট জমির অংশ
ইউরোপ (রাশিয়া ছাড়া)	৪·৯	১·৫	৩১%	০·৫	১০%	০·৯	১৮%	১·৫	৩১%	8·8	৯০%
রাশিয়া	২২·৪	২·২	১০%	১·৮	৮%	৪·১	১৮%	৬·৯	৩১%	১৫·০	৬৭%
এশিয়া (রাশিয়া বাদে)	২৭·০	৪·১	১৫%	২·৯	১১%	৬·১	২২%	৭·১	২৬%	২০·২	৭৫%
আফ্রিকা	৩০·২	২·৪	৮%	২·৬	৯%	৭·৪	২৪%	৯·৫	৩১%	২১·৯	৭২%
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	১৮·৫	২·৩	১২%	২·২	১১%	২·৯	১৫%	৪·৪	২৩%	১১·৮	৬১%
মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	২০·৪	১·০	৫%	৩·০	১৫%	৫·১	২৫%	৬·০	২৯%	১৫·১	৭৩%
ওসিয়ানা	৮·৬	০·৩	৩%	০·৫	৬%	১·৭	২০%	৩·০	৩৫%	৫·৫	৬৪%
সমগ্রপৃথিবী	১৩৫·০	১৩·২	১০%	১৩·৫	১০%	২১ %	৩৮%	২৮%	৯৩%	৯	৭০%

এ সংখ্যাতত্ত্ব ইউ. এন. ওর সরবরাহকৃত তথ্য থেকে Prof G. D. Burnel তদীয় পুস্তক World Without War, 1922 এর ৬৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন।

অন্যথায় "এ বিস্তীর্ণ উদ্যানে অভাব নিরসনের উপায় ও প্রাচুর্য সবই আছে।"

২. দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে খাদ্যশস্যের উৎপাদন। পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের মাত্র শতকরা ১০ ভাগে বর্তমানে চাষাবাদ করা হয়। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ থেকে জংগল, বাসস্থান ইত্যাদি বাদ দিলেও শতকরা ৭০ ভাগ এখনও অনাবাদী রয়েছে। শতকরা যে দশ ভাগ জমি চাষাবাদ করা হয়, তার মধ্যেই জমির পূর্ণ উৎপাদন শক্তি ব্যবহারকারী চাষাবাদের পরিমাণ খুবই কম। চাষাবাদকৃত জমি কি পরিমাণ ও কোন উপায়ে বাড়ানো সম্ভব তা পরবর্তী পৃষ্ঠার সংখ্যাতত্ত্বের তালিকায় দেয়া হলো।

এসব সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা গেল ঃ

* দুনিয়ার মোট ভূ–ভাগের মাত্র শতকরা দশ ভাগে এখন চাষাবাদ চলছে, অথচ শতকরা ৭০ ভাগ চাষ করা যেতে পারে অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ জমি এখনও অনাবাদী রয়েছে।

* বর্তমানে যে জমিতে চাষাবাদ হয় তার পরিমাণ হচ্ছে ১,৩৩,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং আরও ১,৩৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি বর্তমান চাষাবাদের ব্যবহৃত উপকরণ দ্বারাই চাষ যোগ্য করা যেতে পারে। এরপর নতুন পুঁজি ও যেসব যন্ত্রপাতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো ব্যবহার করে আরো ২,৮২,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি চাষ যোগ্য করে তোলা যায় এবং এ পরিমাণ জমি মোট জমির শতকরা ২১ ভাগ মাত্র। তারপরও অবশিষ্ট জমি থেকে ৩,৮৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি নয় উপকরণ আবিষ্কার করে চাষ যোগ্য করা যায় এবং তা মোট জমির শতকরা ২৮ ভাগ।

এসব সংখ্যা থেকেই উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব।

৩। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের চাষাধীন জমির উৎপাদনের পরিমাণ সমান নয়। যেসব দেশে তুলনামূলকভাবে গড়ে প্রতি একর জমিতে কম ফসল উৎপন্ন হয় সেখানে উন্নত কৃষি প্রণালীর সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। পাকিস্তানের তুলনায় প্রতি একর জমিতে জাপানে তিন গুণ ও হল্যাণ্ডে চার গুণ ফসল উৎপন্ন হয়। উন্নত দেশগুলোতে একই জমি থেকে প্রতি বছর দুই বা তিনটি করে ফসল উৎপন্ন করা হয়। প্রতি একরে উৎপাদনের পার্থক্য নিম্নের হিসাব থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

গম উৎপাদন[৭৮]

দেশ	একর প্রতি উৎপাদনের হার (মেট্রিক টন)	
	১৯৩৪–৩৮	১৯৫৬
ডেনমার্ক	১.২৩	১.৬৩
হল্যাণ্ড	১.২৩	১.৪৫
ইংল্যাণ্ড	০.৯৪	১.২৬
মিশর	.৮১	.৯৫
জাপান	.৭৬	.৮৫
পাকিস্তান	.৩৪	.৩০
ভারত	.২৪	.২৯

এ হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচ্য দেশগুলো তাদের উৎপাদনের হার বর্তমান একর প্রতি উৎপাদনের তুলনায় ৩/৪ গুণ বাড়াতে পারে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোও গত ৩০ বছরে উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ডের বাড়তি শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি।

৪। বিগত পঁচিশ বছরের শস্য উৎপাদনের হিসাব করলে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে খাদ্য উৎপাদনের হার অনেক বেশী। ডাড্‌লে স্টাম্পের হিসাব অনুসারে বিগত পঁচিশ বছরের শস্য উৎপাদনের হার নিম্নরূপ।[৭৯]

	১৯৩৪–৩৮	১৯৪৮–৫২	১৯৫৭–৫৯
খাদ্য	৮৫	১০০	১১৩
জনসংখ্যা	৯০	১০০	১১২.২
	(১৯৩৫)	(১৯৫০)	(১৯৫৭)

অর্থাৎ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বেশী। স্টাম্পের ভাষায় "আমরা যদি কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাতের ওপর নির্ভর করি তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার

৭৮. Stamp Dudley, Our Developing World, Page-73.
৭৯. Stamp Dulcy, Our Developing Wold. Page-71

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।'

ইউ. এনওর– ফুড এ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গেনাইজেশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মোট খাদ্য উৎপাদনের অনুপাত ১৯৫২–৫৩ সালে ৯৪ ছিল। ১৯৫৮–৫৯– এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১৩ হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেও যদি এতদ্‌সঙ্গে ধরা যায় তাহলে জনপ্রতি উৎপাদনের হিসাব নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ[৮০]

জনপ্রতি উৎপাদন		
	১৯৫২–৫৩	১৯৫৮–৫৯
খাদ্য	৯৭	১০৬
মোট কৃষিজাত দ্রব্য	৯৭	১০৫

এভাবে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন হার পর্যলোচনা করলে বাড়তির হার নিম্নরূপ দেখা যায়ঃ

খাদ্য উৎপাদনের হিসাব[৮০-ক]		
দেশ	১৯৫২–৫৩	১৯৫৮–৫৯
অস্ট্রিয়া	৯১	১২২
গ্রীস	৮১	১২০
ইংলন্ড	৯৫	১০৫
আমেরিকা	৯৮	১১২
ব্রাজিল	৮৯	১১৯
মেক্সিকো	৮৭	১২৩
ভারত	৯০	১০৫
জাপান	৯৭	১১৯
ইসরায়ীল	৮২	১৩০
তিউনীস	৯৫	১৩৭
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	৮৬	১১১
অস্ট্রেলিয়া	৯৮	১২০

৮০. Production year Book, Food and Agriculture Organisation of United Nations, Rome, Vol-13, 1959, PP 27-28.
(৮০–ক). উপরোক্ত গ্রন্থ, ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এসব দেশেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী ছিল এবং সমগ্র দুনিয়ার জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গতিও ছিল অনুরূপ।

৫. এসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, উৎপাদনের অভাব অথবা অর্থনৈতিক অসংগতির কোন প্রকার সমস্যার রূপ ধারণ করার আশংকা নিকট ভবিষ্যতে তো নেই–ই, সুদূর ভবিষ্যতেও নেই।

জে. ডি. কর্নেল লিখেন, "এখন থেকে এক শত বছর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ বা তিন গুণ হয়ে যাবে।" অর্থাৎ অনুমান করা যায় যে, একুশ শতকের শেষার্ধে জনসংখা ৬ অর্বুদ থেকে ১২ অর্বুদের মধ্যে পৌছে যাবে। এখন হিসাব দৃষ্টে বোঝা যায় যে, বর্তমান কৃষি পদ্ধতিতে কোন অস্বাভাবিক বোঝা না চাপিয়েই অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহৃত উপায়–উপকরণ এবং বর্তমানে আধা শিল্পায়িত দেশগুলোতে যেসব বৈজ্ঞানিক উপাদান ব্যবহৃত হয়, সেসব সরঞ্জামাদির দ্বারাই উল্লিখিত জনসংখ্যার প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। অন্য কথায় পরবর্তী এক্'শ বছরের মধ্যে খাদ্যাভাবের কোন আশংকাই নেই। যদি কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তবে তা মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতার দরুণ হতে পারে।"[৮১]

এফ. এ. ও. (F. A, o)-র দশসালা রিপোর্টে (১৯৪৫–৫৫) সমগ্র দুনিয়ার অবস্থা পর্যালোচনা করার পর এ সিদ্ধান্ত করা হয় , " এসব তথ্য আমাদের এ বিশ্বাসকে আরো মজুত করে দেয় যে, পরবর্তী একশো বছরে দুনিয়ার অবশিষ্ট দুই–তৃতীয়াংশ স্থানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে ধরনেরই বিপ্লব সাধিত হবে যে ধরনের উন্নতি এ যাবৎ মাত্র এক–তৃতীয়াংশ স্থানে হয়েছে।"

উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লিখিত রিপোর্ট প্রণেতা ডাঃ লামাটিন ইয়েট্স লিখেছেনঃ

"গভীর আশাবাদিগণ আজ পর্যন্ত যে অনুমান কায়েম করেছেন তার চাইতে উপরোল্লেখিত প্রোগামে সামগ্রিকভাবে অধিকতর সাফল্য লাভ করার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।"[৮২]

এফ. এ. ও.–রই অন্য এক রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ

"জনসংখ্যা, খাদ্য, কৃষি ও শিল্প সম্পর্কিত বিতর্কে যে সব বিভ্রান্তি (Confusion) দেখা যায় এর কারণ হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপকরণাদি

---

৮১. Bernel. J. D, World Without War P. 66.

৮২. So Bold an Aim. F. A. O. 1955 P. 130.

সম্পর্কে আমাদের সঠিক তথ্য জানার অভাব। কখনও কখনও মনে হয় যে, কৃষি উৎপাদন যোগ্য জমির উৎপাদন শক্তি ক্ষয়িষ্ণু (Exhaustiblc) বলে ধরে নেয়া হয়েছে। একটি কয়লার খনিতে যেভাবে উত্তরোত্তর কয়লার পরিমাণ হ্রাস পায় ঠিক সেভাবেই জমির উৎপাদন শক্তি কমে যায় মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দূরদর্শিতার অভাবে ও ভুল পন্থায় কাজ করার দরুন এ শক্তি কমে যেতে পারে। কিন্তু জমির উৎপাদনক্ষমতা পুনর্বহাল করা যেমন সম্ভব তেমনি বাড়ানোও সম্ভব। নৈরাশ্যবাদীপ্রচারণা আজ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এ দলের লোকদের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জমি তার উৎপাদন ক্ষমতার শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালের বিশেষজ্ঞগণ এ নৈরাশ্যবাদী মতবাদের সঙ্গে মোটেই একমত নন।"[৮৩]

বিখ্যাত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ডঃ কলিন ক্লার্ক অনস্বীকার্য তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে দাবী করেন যে, যদি দুনিয়ার সকল জমি সঠিকরূপে কার্যে নিয়োজিত হয় (যা হল্যান্ডের চাষিগণ করে থাকে) তাহলে বর্তমান কৃষি পদ্ধতিতেই বর্তমান জনসংখ্যার দশ গুণ পরিমাণ মানুষকে (অর্থাৎ ২৮ অর্বুদ মানুষকে) পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্রচলিত উচ্চমানের খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব এবং জনসংখ্যা সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করার কোন আশঙ্কাই থাকে না।[৮৪]

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উপকরণ ও জনসংখ্যা

পাকিস্তান সম্পর্কে তো এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, আমাদের এ অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ হচ্ছে নিজেদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা। নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও আমাদের জনসংখ্যা এবং এর বংশ বৃদ্ধির হার আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয়, বরং আল্লাহর রহমতস্বরূপ। এ সম্পর্কে জরুরী তথ্য পেশ করা হচ্ছে।

(ক) অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে উন্নত ও উন্নতশীল অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য থাকা অপরিহার্য। বিগত ২০০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল শিল্পপ্রধান দেশেই গঠন যুগে জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে এবং এ বৃদ্ধি সেসব দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা ও হ্রাসপাপ্তি ঘটেছে ওই সব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হয়ে

---

৮৩. Agriculture in the World Economy, Rome, F. A. O. 1956. Page, 35.

৮৪. Colin clerk, Poputation and Living standard". International Labour Review, August, 1953. এ ব্যাপারে আরো পরিস্কার ধারণা জন্মবার জন্যে পড়ুনঃ বৃটিশ মেডিকেল জার্নাল, লন্ডন, ৮ই জুলাই, ৬১, ১১৯-২০ পৃষ্ঠা, বিশেষত লর্ড ব্রাবাজান (Lord Brabazan) ও লর্ড হেইলশ্যামের (Haisham) বক্তৃতার নোট।

শক্তিশালী হয়ে যাবার পর। এর পূর্বে উন্নয়ন যুগে তা সম্ভব হয় নি। প্রফেসর অর্গনস্কি (P. K. Organski) তাঁর একটি সদ্য প্রকাশিত প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইউরোপকে দুনিয়ার এক নম্বর শক্তিতে পরিণত করেছে। ইউরোপের জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলেই তার শিল্প প্রধান অর্থনীতি পরিচালনা করার জন্যে কর্মী এবং ইউরোপের বাইরে দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাবার জন্যে প্রবাসী ও সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং এরা দূরদূরান্তে বিস্তৃত অর্ধেক পৃথিবীব্যাপী সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।"[৮৫]

এ ব্যাপারে কলিন ক্লার্ক নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেনঃ "আধুনিক সমাজের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশীর ভাগই জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে।'[৮৬]

প্রফেসার থম্পসন নিম্নলিখিত ভাষায় একটি ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করে বলেনঃ

"মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে সর্বপ্রথম জনসংখ্যাই প্রভাবান্বিত হয়, যার ফলে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জনসংখ্যার হার তীব্রগতিতে বাড়াতে থাকে। প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকে।"[৮৭]

এজন্যেই উন্নয়নশীল সমাজের সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তাকে উন্নত সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে বিচার করা ভুল। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাওয়া অপরিহার্য। এ ধরনের সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনাযঘসম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ যে অনেক বেশী তা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই সুস্পষ্টরূপে জানা যায়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিভিন্ন কারণে উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু যে উন্নতির প্রতিবন্ধক নয় তাই নয়, বরং উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত জরুরী।

(খ) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিবারের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নিছক পুঁথিগত বিদ্যাই যাদের সম্বল, শুধু সংখ্যার উত্থান-পতনেই যারা

---

৮৫. ডন্ করাচী ১৭ই জুলাই, ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত আসাওয়ার্ড লোরীর "Population Explosion" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৮৬. Poulation Growth and Living Standard"

৮৭. থম্পসন "জনসংখ্যা সমস্যা" বিষয়ক পুস্তক, ৮৩ পৃঃ।

ভীতচকিত হয়ে ওঠেন, তাদের পক্ষে বিষয়টি বুঝে ওঠা মুশকিল। কিন্তু যাঁরা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল তাঁরা জানেন যে, কৃষক পরিবারের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিরাট সম্পদ বলে প্রমাণিত হয়; কৃষিনির্ভরশীল পরিবারে লোকাভাবের দরুন শ্রমিক নিয়োগ করতে বাধ্য হওয়ার চাইতে বড় বিপদ আর কিছুই নেই। অধুনা সমাজবিজ্ঞান বিশেজ্ঞগণও বিষয়টিকে উপলব্দি করতে পেরেছেন। প্রফেসার ঈগন আর্নেস্ট বার্গেল (Egon Ernest Bergel) বলেনঃ

"সন্তান কৃষকের জন্যে অর্থনৈতিক পুঁজি (Asssct) এবং শহরবাসীর জন্যে দায় (Liability)। কৃষকের দারিদ্র্য যত বেশী হবে, সন্তানহীনতা তার জন্যে ততই বেশী অসহ্য হবে। কৃষিভিত্তিক সমাজে ছোট শিশুর জন্যে স্থান ও খাদ্য সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কষ্টকর নয় এবং শিশুর লালন-পালনে কোন অসুবিধা দেখা দেয় না। কেননা কৃষি ক্ষেত্রই একমাত্র স্থান যেখানে মা তার সন্তানের দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের কাজও অতি স্বচ্ছন্দে করে যেতে পারে।"[৮৮]

প্রফেসার আর্নল্ড গ্রীনও অন্যভাবে এই একই মত প্রকাশ করেছেনঃ

"প্রাচীন গ্রাম্য পারিবারিক প্রথায় সন্তান দুটি উপায়ে পিতার উপকার করতোঃ প্রথমত, অল্পবয়সেই সন্তান কৃষি কাজে অংশ গ্রহণ করে পিতার অর্থনৈতিক মূলধনে পরিণত হতো।

দ্বিতীয়ত, সন্তান পিতার নাম ও বংশ-পরিচয় বহাল রাখার উপাদানস্বরূপ পিতাকে মানসিক শান্তি দান করতো"[৮৯]

পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন কৃষি উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এমতাবস্থায় মেহনতী লোকের সংখ্যা কমানো কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশগুলোর অবস্থা দেখে দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যে একই পন্থা অনুসরণ করা আমাদের জন্যে কখনও সুষ্ঠ চিন্তার পরিচায়ক হতে পারে না।

(গ) সাম্প্রতিক আদমশুমারী মুতাবিক দেশের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৯ কোটি ৩৮লক্ষ ১হাজার ৫শত ৫৬ জন এবং সমগ্র দেশে লোকবসতির হার হচ্ছে প্রতি বর্গমাইলে ২৫৬ জন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশী। এজন্যে দেশের দুই অংশে লোকবসতির হার একরূপ নয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি বর্গমাইলে লোক বসতির গড় পড়তা হার ৯৯৩ জন, পশ্চিম পাকিস্তানে এর হার ১৩৮ জন।

---

৮৮. Bergel Egon Ernest, Urban Sociology, 1955, P. 292.
৮৯. আর্নল্ড গ্রীন-A Modern Introduction to the Family. Page-566.

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানে রীতিমত লোকাভাব রয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানেও কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দেয় নি। কারণ প্রতি বর্গমাইলে লোক বসতির হার ইংল্যাণ্ডে ১,৮৫৩, হল্যাণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে উচ্চমানের জীবন যাপনকারী প্রায় ১,০০০ লোকের বাস এবং জাপানের ব্যবহারযোগ্য জমিতে (শতকরা মাত্র ১৭ ভাগ ব্যবহার যোগ্য) প্রতি বর্গমাইলে ৩,০০০ লোকের বাস।

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের কৃষি– যোগ্য জমির পরিমাণ অনুপাতে প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতির হার নিম্নরুপঃ

আমেরিকা–	২৯৩
সুইডেন–	৪৮৯
ফ্রান্স–	৫১১
ভারত–	৭৮৬
ইটালী–	৯৩৬
বেলজিয়াম–	২,১৫৫
হল্যান্ড–	২,৩৯৫
সুইজারল্যান্ড–	২,৪০৬
জাপান–	৩,৫৭৫

উপরের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আমাদের দেশে এখনও অনেক লোক সংকুলানের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আমাদের তুলনায় প্রতি বর্গমাইলে ৪ গুণ বেশী লোক বসিত হওয়া সত্বেও হল্যান্ড এবং পাচঁগুণ লোক বসতি সত্বেও জাপান প্রয়োজনাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে নিস্পিষ্ট হয়ে না থাকে তাহলে আমাদের জনসংখ্যা দেশের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কিভাবে? কিছুসংখ্যা লোকের মগজে এধরনের সমস্যা হয়তো বা রয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে বাস্তব ক্ষেত্র এ ধরনের কোন সমস্যার অস্তিত্ব মাত্রও নেই।

(ঘ) আমাদের দেশের মোট ভূ–খন্ডের মাত্র শতকরা ২৬ ভাগে কৃষিকার্য হয়ে থাকে। শতকরা ১৩ ভাগ এমন ধরনের জমি রয়েছে যা বর্তমান কৃষি উপকরণের দ্বারাই কৃষিযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া শতকরা২৪ ভাগ জমি এখনো জরফিই করা হয়নি। এ–জমির বেশী অংশই অতি সামান্য চেষ্টা শ্রমের ফলে কৃষিযোগ্যে হয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়। এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, দেশের মোট জমির শতকরা ১৫ ভাগের অদুর ভবিষ্যতেই কৃষিকার্য করা সম্ভব। সুতরাং জমির অভাব কোথায়?

(ঙ) একর প্রতি উৎপাদনের হার হিসাব করে দেখা যায় আমরা এখনও দুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায় পেছনে পড়ে আছি। কৃষি যন্ত্রপাতিকে উন্নতি করে আমরা উৎপাদনে বাড়াতে পারি।

আমাদের দেশের তুলনায় একর প্রতি গম উৎপাদনের পরিমাণ ডেনমার্ক ও হল্যান্ডে ৫ গুণ, ইংলন্ড ও জার্মানীতে ৪ গুণ এবং জাপান ও মিশরে ৩ গুণ বেশী।[১০] দুনিয়ার অন্যান্য দেশ তাতের উৎপাদনের পরিমাণকে যে পর্যায়ে পৌছিয়েছে এবং যেখানে থেকে আরও উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছে, আমরা আমাদের উৎপাদনের পরিমাণকে সে পর্যায়ে কেন পৌছাতে পারব না?

কোন দেশের উৎপাদিত ফসল ওজন করার একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হচ্ছে এস. এন. ইউ. (SNU)। মিঃ ডাড্লে স্ট্যাম্প ঐ মানদণ্ডে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনা করে বলেছেনঃ

"জাপান প্রতি একর জমিতে ৬ থেকে ৭ এস. এন.ইউ ফসল উৎপন্ন করে নেয় অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে তার উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৪০০০ এস. এন. ইউ. এ হিসেব থেকে আমরা বলতে পারি যে, কৃষিযোগ্য জমির প্রতি বর্গমাইলে ৪০০০ লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হতে পারে।[৯১]

(চ) এছাড়া শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রের মাধ্যমে সুখ-স্বাচ্ছন্দের উচ্চতম শিখরে পৌছান সম্ভব। এ উভয় পন্থায় উন্নতির সম্ভাবনাও সীমাহীন। মানুষ ভুলে যায় যে, দুনিয়াতে যারা আসে তাদের কারো খাবার আমাদের দিতে হয় না। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই তার রেজেকদাতা এবং ঐ নবাগত ব্যক্তি নিজের শ্রমের ফলেই তা ভোগ করতে থাকে। অর্থনৈতিক উপকরণ ও তথ্যাবলীর প্রতি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, মানব বংশ ধ্বংস করার কর্মপন্থা গ্রহণের সপক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ বর্তমান নেই। ম্যালথাসের অনুসারীরা চিত্রের মাত্র একটি দিকই পেশ করে এবং অর্থনীতির নামে এমন সব বিষয় প্রকাশ করে যেগুলোর কোন সমর্থনই অর্থনীতি বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ কারণেই প্রফেসার কলিন ক্লার্ক ম্যালথাসপন্থীদের অর্থনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাদের এ দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করেনঃ

"এ ভদ্রলোকেরা বলে থাকেন যে, এদের দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটি বিজ্ঞানভিত্তিক। যদি তাই

---

১০. একর প্রতি উৎপাদনের হার তুলনা করে আমাদের দেশের অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

৯১. ঐ পুস্তক, ১২০ পৃষ্ঠা

হয়, তাহলে এটাও সত্য কথা যে, এরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের দৈন্যে দুনিয়ার এদের সমকক্ষ অপর কোন বৈজ্ঞানিক দল নেই। ম্যলথাসের অবস্থা এই যে, তিনি জনসংখ্যা সম্পর্কে মৌলিক ও সাধারণ বিষয়গুলোও জানেন না। আর জনসংখ্যা সম্পর্কে অল্পবিস্তুর কিছু যদিও জানেন, অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান প্রায় অজ্ঞতার কাছাকাছি।"[৯২]

দেশঃ		গম (১৯৫৬) একর প্রতি উৎপাদন (মেট্রিক টন)	দেশঃ		চাউল (১৯৫৬) একর প্রতি উৎপাদন (মেট্রিক টন)
ডেনমার্ক	...	১.৬৩	স্পেন	...	২. ৩৫
হল্যান্ড	...	১.৪৫	ইটালী	...	১.৯০
বেলজিয়াম	...	১.২৮	অষ্ট্রেলিয়া	...	২.১৪
ইংলণ্ড	...	১.২৬	মিশর	...	২.২০
মিশর	...	.৯৫	জাপান	...	১.৭০
জাপান	...	.৮৫	পাকিস্তান	...	.৬২
পাকিস্তান	...	.৩			

Our Developing World. Page 71-16 Stamp Dudcly.

উপরিউক্ত তথ্য ও যুক্তিসমূহ অধ্যয়ন করার পরও যদি কেউ বাড়তি জনসংখ্যা কি খাবে ও কোথায় থাকবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে, তাহলে ওটা তার নিজেরই ভুল। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মানবীয় কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করে চিন্তা ও কাজ করা। এ সীমা অতিক্রম করে মানুষ যদি আল্লার কর্মসীমায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তাহলে এমন সব জটিল সমস্যা সৃষ্টি করবে যার কোন সমাধান তাদের জানা নেই।

মৃত্যুর পরিবর্তে জন্মনিরোধ

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ স্বীকার করেন যে, বিভিন্ন ধরনের জীবের সংখ্যাকে এক সঙ্গত সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এবং এ

৯২. Colin Clark, "Population Growth and Living Standars" International Labour Reviw, Vol-LXVIII, No. 2 August, 1953.

ব্যবস্থা মানব জাতির ওপরও কার্যকরী আছে। কিন্তু তারা বলে যে, প্রকৃতি মৃত্যুর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বহাল রাখে এবং তদ্দরুন মানুষকে কঠিন দৈহিক ও আত্মিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়। কাজেই মৃত্যুর পরিবর্তে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করে জনসংখ্যাকে সীমিত করতে বাধা কি? তারা আরো বলে, জীবন্ত মানুষের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের যাতনায় ক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ এবং দারিদ্র্যের নানাধিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন যাপনের তুলনায় প্রয়োজনের অধিক সংখ্যক মানুষের জন্মরোধ করা শত গুণে শ্রেয়।

এখানে পুনরায় এ শ্রেণীর লোকের- অযৌক্তিকভাবে আল্লাহর ব্যস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে। আমি জিজ্ঞেস করি, তাদের সাবধানতা অবলম্বনের ফলে কি যুদ্ধ, মহামারী, রোগ, বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়, রেল, মোটরগাড়ী ও বিনান দুর্ঘটনাদি বন্ধ হয়ে যাবে? তারা কি আল্লার সঙ্গে অথবা (তাদের মতানুসারে প্রকৃতির সঙ্গে) এমন কোন চুক্তি করেছে যার ফলে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ শুরু করলেই মৃত্যুর ভারপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে অবসর দান করা হবে? যদি তা না হয়ে থাকে, আর নিশ্চয়ই তা হয় নি, তাহলে মৃত্যুর ফেরেশতা এবং তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ এ উভয় শক্তির চাপে বেচারা মানুষের কী দুর্গতি হবে? একদিকে তারা নিজ হাতেই নিজেদের সংখ্যা কমিয়ে যাবে আর অপরদিকে মৃত্যুর ফেরেশতা, ভূমিকম্প ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজর মানুষকে একই সঙ্গে মরণের কোলে ঠেলে দেবে-বন্যা ও ঝড়ে জনপদের পর জনপদ উড়ে যাবে। দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষ মরতে থাকবে-মহামারী এসে জনপদগুলোকে একের পর এক জনশূন্য করবে--যুদ্ধে তাহাদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র লক্ষ- কোটি মানুষকে মৃত্যুর কোলে শায়িত করবে। আর মৃত্যুর ফেরেশতা এক এক করে পৃথকভাবে মানুষের প্রাণ হরণ করতে থাকবে। তারা কি এতটুকুও হিসাব করতে পারে না যে, আয় কমে গিয়ে খরচ পুরাদস্তুর বহাল থাকলে তহবিল কতদিন পূর্ণ থাকতে পরে;[৯৩] তাদের কাছে জনসংখ্যায় সঙ্গত পরিমাণ

---

৯৩. শুধু ইউরোপেই (রাশিয়া ছাড়া) প্রথম মহাযুদ্ধের দরুন ২ কোটি ২৬ লক্ষ লোক কমে যায়। সামরিক লোকদের মৃত্যু, সাধারণ মৃত্যুহারের অতিরিক্ত সংখ্যক নাগরিকদের মৃত্যু এবং জন্মহার হ্রাসজনিত ১ কোটি ২৬ লক্ষ লোকের ঘাটতিও (Birth Deficit)-এর হিসাবে ধরা হয়েছে। রাশিয়াতে ১ম মহাযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের দরুন জন্মহার ১ কোটি কমতি দেখা যায়। জার্মানী সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, ১৯ লক্ষ লোক যুদ্ধে নিহত হয়, দাম্পত্য বিচ্ছেদের দরুন ২৫ লক্ষ শিশু এবং যুদ্ধজনিত জন্মহার হ্রাসের দরুন ২৬ লক্ষ শিশু কম পয়দা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা ৯৫ লক্ষ থেকে এক কোটি পর্যন্ত অনুমিত হয়। জন্মহ্রাসের দরুন শুধু ফ্রান্সেই ১২ লক্ষ লোক হ্রাস পায়। বেলজিয়ামের অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয় ছিলো, এজন্যেই বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। আর শুধু যে যুদ্ধের ময়দানেই মানুষ কমে যায় তাই নয় -যুদ্ধের অংশীদার দেশগুলোর ঘরে ঘরে সনতানের সংখ্যাও কমে যায়। শুধু

জানার কোন উপায় আছে কি–না এ প্রশ্নটা না হয় ছেড়েই দিলাম। যদিও ধরে নেয়া যায় যে, এটা তাদের জানাই আছে, তবুও প্রশ্ন ওঠে যে, তারা কি প্রয়োজন মোতাবেক সন্তান জন্মাতে ও প্রয়োজন পূরণ হলে জন্ম বন্ধ করতে সমর্থ? জনসাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতার সৃষ্টি হলে এবং নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা ও রুচি মোতাবেক সন্তানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফায়সালা করার অধিকার অর্জন ও জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণাদি সকলের নিকট সহজলভ্য হলে দেশ ও জাতির জন সংখ্যাকে কোন নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব কি? অনুমানের কোন প্রয়োজন নেই–অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, দুনিয়ার সবচাইতে উন্নত দেশের পক্ষেও নিজেদের জন্যে একটি সঙ্গত জনসংখ্যার সীমা নির্ধারণ এবং জনগণকে তদনুসারে আমল করতে বাধ্য করার ব্যাপারে সফলতা অর্জন সম্ভব হয় নি, তাই জিজ্ঞাসা করি, কোন্ হাতিয়ার নিয়ে তারা খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে দেশ ও জনপদের জন্যে সঙ্গত জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং তদনুসারে লোকসংখ্যা বাড়ানো বা কমানোর দুঃসাহসী কাজে অগ্রসর হতে চায়?

অর্থনৈকিত অজুহাত

জন্মনিরোধের সমর্থকগণ বলে, "সীমাবদ্ধ অর্থ উপার্জনকারী পিতামাতা অধিক সংখ্যক সন্তানকে ভাল শিক্ষা, স্বচ্ছন্দ সামাজিক পরিবেশ ও উন্নত জীবন সূচনা দান করতে পারে না। সন্তানের সংখ্যা পিতামাতার প্রতিপালন ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে গেলে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো বিগ্‌ড়ে যায়। এর ফলে সন্তানের শিক্ষা, লালন–পালন, আহার–বাসস্থান ও পোশাক–পরিচ্ছদ সবই নিকৃষ্ট ধরনের হতে বাধ্য হয় এবং এ ছাড়া ঐসব সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও সব দিক দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অযথা সন্তানের সংখ্যা বাড়ানোর চাইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পিতামাতার শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সন্তান স্বল্প রাখাই ভাল। আর প্রতিকূল

যুদ্ধে শিশু মানব বংশই হ্রাস পায় না, বরং পরবর্তী বংশধরও কমে যায়। [লিন্ডেস, সোশাল প্রোবলেম্ স ৪৭৭–৭৯পৃঃ]

অনুরূপভাবেই দুর্ভিক্ষের প্রশ্ন ওঠে। ১৯২০–২১ সালে চীনে ৫ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের দুরুন মারা যায়। ১৯৪০–৪৩ সালে পীত নদীর অববাহিকায় ৬০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ ও বন্যার কবলে পড়ে এবং তাদের অন্তত দশ লক্ষ লোক মরে গিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ১৯৪৩–৪৬ সালে গ্রীসের সকল অধিবাসীই দুর্ভিক্ষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। রেডক্রসের বিপুল পরিমাণ সাহায্য সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক মৃত্যু বরণ করে।

মহামারীতেও হামেশা বিপুল সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করছে। ১৯১৮–১৯ সালে আমেরিকার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৫ লক্ষ লোক মারা যায়। ঐ একই রোগে ভারতে দেড় কোটি এবং তাহিতী দ্বীপের এক–সপ্তমাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধে যত লোক মারা যায় তার চাইতে বেশী পরিমাণ মরে কুৎসিত রোগে।

অবস্থায় সন্তান জন্মানোর ধারা মুলতবীও রাখা যেতে পারে। সমষ্টিগত কল্যাণ ও তরক্কীর জন্যে এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থা আর হতেই পারে না।"

আজকাল এ যুক্তি মানুষের কাছে খুবই সমাদর লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্বের দু'টি যুক্তির মতই এটিও একটি দুর্বল যুক্তি। প্রথম কথা এই যে, 'উত্তম শিক্ষা ও লালন-পালন, স্বচ্ছ সামাজিক পরিবেশ' ও 'উন্নত জীবন-সূচনা' কথাগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট। কেননা এগুলোর কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মানদন্ড নেই। প্রত্যেকের মনেই এসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বিরাজ করে এবং প্রত্যেকেই নিজের অবস্থার সঙেগ তুলনা না করে নিজের চাইতে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তির জীবনযাত্রার পর্যায়ে পৌঁছার লোভাতুর মনোভাব নিয়ে এসব বিষয়ে মাত্রা ঠিক করে, এ ধরনের ভ্রান্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যদি সন্তানদের জন্য 'উত্তম শিক্ষা ও লালন-পালন,' 'স্বচ্ছন্দ সামাজিক পরিবেশ' এবং 'উন্নত জীবন সূচনা'র খাহেশ কেউ করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে একটি বা দু'টি সন্তানের বেশি পছন্দ করবে না। অনেকে তো নিঃসন্তান থাকাই পছন্দ করবে। কেননা সাধারণত মানুষের জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত ধারণা তার সমকালীন উপার্জনের পরিমাণের চাইতে অনেক উচ্চে থাকে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সে যে কাম্য বিষয়াদির ফিরিস্তি তৈরি করে রাখে তা অনেক ক্ষেত্রেই হাসিল করা সম্ভব হয় না। এটা নিছক যুক্তির খাতিরে যুক্তি পেশ করার জন্যে বলছি না, বরং এটা একটা বাস্তব সত্য। বর্তমান ইউরোপে লক্ষ লক্ষ দম্পতি রয়েছে যারা শুধু এজন্যে নিঃসন্তান থাকা পছন্দ করেছে যে, সন্তানদের শিক্ষা ও লালন-পালন সম্পর্কে তার-এমন একটি উচ্চমান নির্ধারণ করে রেখেছে যার ফলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সাধ্যই তাদের নেই।

এছাড়া নীতিগতভাবেও উপরিউক্ত যুক্তি ভুল। সন্তান-সন্ততির আশৈশব সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশে লালিত হওয়া এবং দুখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অভাব ও কঠোরতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা জাতির উন্নতির সহায়ক হয় না। এর ফলে স্কুল কলেজের চাইতেও উন্নত শিক্ষার স্থল বাস্তব কর্মক্ষেত্র তাদের শিক্ষা দানের অনুপযোগী হয়ে যায়। বাস্তব জগতের শিক্ষাগার হচ্ছে যুগ ও কালের শিক্ষাগার। আল্লাহ তায়ালা এ শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করে তার মাধ্যমে মানুষের ধৈর্য, দৃঢ়তা, সাহস ও উৎসাহের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং যারা এতে পূর্ণরূপে যোগ্যতার প্রমাণ দেয় তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ - البقرة : ١٥٥

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং জান-প্রাণ-ধন সম্পদ ও ফল-শস্যের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। এ ব্যাপারে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের জন্য সুসংবাদ।"

এটা একটা হাপর যা খাঁটি ও ভেজালকে পৃথক করে দেয় এবং উত্তাপের পর উত্তাপ সৃষ্টি করে ভেজাল বস্তুকে বের কের দেয়। এখানে বিপদ অবতীর্ণ হয় মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি জন্মানোর উদ্দেশ্যে, দুঃখ-কষ্ট অর্পিত হয় মানুষের মনে এসব জয় করার মত সংগ্রামী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে এবং মানুষের দুর্বলতা দূর করে দিয়ে তার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তোলার জন্যেই কঠোরতা আসে। এ খোদায়ী শিক্ষাগার থেকে যাঁরা ডিগ্রী নিয়ে বের হয় তাঁরা দুনিয়াতে কিছু করে দেখাতে পারেন এবং আজ পর্যন্ত দুনিয়ার বড় বড় কাজ যাঁরা করে গেছেন তাঁরা সকলেই উল্লিখিত শিক্ষাগার থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিয়ে দুনিয়াকে আরাম ও বিলাসিতার স্থানে পরিণত করার ফল হবে এই যে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আরামপ্রিয়, নিরুৎসাহী , কর্ম-বিমুখ ও কাপুরুষ হবে। প্রাচুর্যের মধ্যে সন্তানের জন্ম, আসমান ছোঁয়া বিরাট শিক্ষাগার ও বিলাসবহুল বাড়ীতে শিক্ষা লাভ এবং যৌবনে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার কালে মোটা অংকের অর্থ দ্বারা জীবনযাত্রা রসূচনা-এ সবের মাধ্যমে তাদের জীবন সফল ও উন্নত হবে বলে আশা করা অর্থহীন। এ ধরনের ব্যবস্থা দ্বারা শুধু তৃতীয় শ্রেণীর জীব তৈরী করা সম্ভব, খুব বেশি চেষ্টা-যত্ন করে ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উর্ধ্বে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ কখনও এ ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি হতে পারে না।

দুনিয়ার ইতিহাস ও মহামানবদের জীবনী থেকেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওযা যাবে। ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর যত মানুষের জীবন কথা পাওযা যায়, তাঁদের শতকরা অন্তত ৯০ জন দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন মাতাপিতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন, দুঃখ মুসিবতের কোলে প্রতিপালিত হয়েছেন, কামনা-বাসনার গলা টিপে হত্যা করে এবং মনের অনেক আশা-আকাঙ্খাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে যৌবনকাল কাটিয়েছেন। এসব মহামানবদের প্রায় সকলকেই সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় জীবনের মহাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁরা উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে সাঁতার শিখেছেন, পানির নির্মম চপেটাঘাতে সামনে এগিয়ে যাবার শিক্ষা পেয়েছেন এবং এভাবে জীবন সংগ্রামে অবিচল থাকার ফলেই একদিন সাফল্যের উপকূলে পৌঁছে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন।

আরও কয়েকটি যুক্তি

ওপরে তিনটি বড় বড় যুক্তির জবাব দেয়া হয়েছে। এদের সঙ্গে আরও তিনটি ছোট

ছোট যুক্তিও আছে। আমরা সংক্ষেপে এগুলো উল্লেখ করবো এবং সংক্ষেপেই এদের জবাব দিয়ে দেবো।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ বলেন, সুস্থ দেহ, মজবুত গঠন ও উচ্চতর কর্মক্ষতার অধিকারী উন্নত ধরনের সন্তান নাকি জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জন্মানো যায়। এ ধরনের বিশ্বাসের মূল হচ্ছে এই যে, কম সংখ্যক সন্তান জন্মানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিশু শক্তিশালী, সুস্থ, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ হবে বলে তাঁরা ধরে নিয়েছেন। তাঁদের ধারণা এই যে, সন্তানের সংখ্যা বেশী হলে সকল সন্তানই দুর্বল, রুগ্ন, অকর্মা ও নির্বোধ হবে। কিন্তু এসব ধারণার সমর্থনে গবেষণামূলক অথবা অভিজ্ঞতা-প্রসূত কোন প্রমাণ নেই। এগুলো নিছক ধারণামাত্র। বাস্তব জগতে এর বিপক্ষে হাজার হাজার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের জন্ম সম্পর্কে মানুষ কোন বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতেই পারে না। এ কাজ সম্পূর্ণই আল্লাহর হাতে এবং তিনি যাকে যেভাবে ইচ্ছা পয়দা করে থাকেন।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - ال عمرن : ٦

"তিনি (হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি) তোমাদের মাতৃগর্ভে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আকার-আকৃতি দান করে থাকেন।"

বলিষ্ঠ, সুস্থ ও বুদ্ধিমান সন্তান জন্মানো এবং দুর্বল, রুগ্ন ও নির্বোধ শিশুর জন্মরোধ মানুষের ক্ষমতার আওতা-বহির্ভূত।

ওপরের যুক্তিটিরই কাছাকাছি আরও একটি যুক্তি হচ্ছে এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় সন্তান লালন-পালনজনিত কষ্ট থেকে রেহাই দেয়। সম্পূর্ণ অকেজো বা বয়োপ্রাপ্তির পূর্বেই যারা মরে যাবে এমন সন্তনের লালন-পালন করে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতো যদি মানুষ পূর্ব থেকে কোন্ সন্তান কি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসছে তা জানতে পারতো। কোন্ সন্তান যোগ্য অথবা অযোগ্য, কে শৈশবেই মরে যাবে বা দীর্ঘজীবী হবে, কে কাজের লোক প্রমাণিত হবে আর কে অকেজো--এসব বিষয় যখন মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তখন উপরিউক্ত যুক্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আর অদৃশ্য বস্তুর প্রতি ঢিল নিক্ষেপ করা, একই কথা।

এ কথাও বলা চলে যে, অধিক সন্তানের জন্ম হলে মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং তার সৌন্দর্য হ্রাস পায়। আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রাখে না। অধিক সন্তান জন্মানোর ফলে নারীর স্বাস্থ্যের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণের দরুনও ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষতি হয়। চিকিৎসা

বিজ্ঞানের ওপর ভরসা করেও কোন্ নারীর স্বাস্থ্য কত সংখ্যক সন্তান জন্মানো পর্যন্ত অক্ষত থাকবে তা নির্ণয় করার উপায় নেই। এটা প্রত্যেক নারীর নিজস্ব অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি কোন চিকিৎসক বিশেষ কোন মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করেন যে, উক্ত মহিলার স্বাস্থ্য গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসবের কষ্ট সহ্য করার অনুপযুক্ত, তাহলে নিঃসন্দেহে জন্মনিরোধ করার জন্যে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। এমনকি মায়ের জীবন রক্ষার জন্যে গর্ভপাত ঘটানো নাজায়েজ নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার অজুহাত খাড়া করে জন্মনিয়ন্ত্রণকে সাধারণ ব্যবস্থা হিসাবে জারী করা এবং স্থায়ীভাবে ঐ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে থাকা কোনমতেই জায়েজ হতে পারে না।

ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকদের উল্লিখিত যুক্তিগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দিলে বোঝা যায়, নাস্তিকতা ও বস্তুবাদই এ বিষবৃক্ষের বীজ। যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার ভিত্তিতে অথবা আল্লাহকে অথর্ব ও অকেজো বিবেচনা করে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে নিজেরাই কর্মপন্থা নির্ণয় করে একমাত্র তাদের দ্বারাই এ আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ঐ ধরনের লোকদের মস্তিষ্কেই এসব যুক্তি প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবার পর উল্লিখিত আন্দোলনটা যে ইসলাম বিরোধী এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। এর যাবতীয় নীতি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নীতির পরিপন্থী এবং যে ধরনের চিন্তাধারা থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন হয়েছে তার উৎখাত সাধনই ইসলামী জীবন বিধানের উদ্দেশ্য।

হাদীস থেকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ পেশ

মুসলমানদের মধ্যে যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থক তাঁরা তাঁদের সমর্থনে কোরআনের একটি শব্দও খুঁজে পাবে না।[৯৪]

এজন্যে তাঁরা হাদীসের আশ্রয় নেন এবং এমন কতিপয় হাদীস পেশ করেন যাতে 'আজল'–এর অনুমতি আছে। কিন্তু হাদীস থেকে দলিল পেশ করার জন্যে কতিপয় বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার, অন্যথায় ফিকাহ্‌র কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব।

প্রথমত– আলোচ্য বিষয়ে হাদীসের বিশেষ অধ্যায়ে যত হাদীস আছে সবগুলোকে একত্র করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

---

৯৪. এক ব্যক্তি কষ্ট করে نسائكم حرث لكم এআয়াতের ভুল ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে এ ভুল অপনোদন করে এসেছি।

দ্বিতীয়– যে অবস্থায় ও পরিবেশে হাদীস বর্ণিত হয়েছিলো তা জানা।

তৃতীয়– ঐ সময় আরব দেশে যে অবস্থা প্রচলিত ছিলো তা অবগত হওয়া।

আমরা এ তিনটি বিষয়কেই সামনে রেখে এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করবো।

সকলেই অবগত আছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে হত্যা করারই নিয়ম প্রচলিত ছিল। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথমটি হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। অনেক মাতাপিতাই দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করতো যাতে করে খাদ্যের অংশীদার কম হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সীমাতিরিক্ত আত্মসম্মান জ্ঞান। অহমিকার দরুনই তারা অনেক সময় কন্যা সন্তানদের হত্যা করতো। ইসলাম এসে কঠোরতার সঙ্গে এ কাজ করতে নিষেধ করে এবং অধিবাসীদের চিন্তার–মানসে পরিবর্তন সাধন করে।

এরপর মুসলমানদের মধ্যে 'আজল' অর্থাৎ স্ত্রীর যৌনপ্রদেশে বীর্যপাত না ঘটিয়ে সঙ্গম করার প্রবণতা জাগে। কিন্তু এ প্রবণতা সর্বত্র প্রচলিত ছিলো না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন আন্দোলনও তখন জারী ছিলো না। 'আজল'কে জাতীয় পরিকল্পনায় শামিল করা সম্পর্কে তখন কেউ চিন্তাও করে নি অথবা জাহেলিয়াতের যুগে যেসব কারণে সন্তান হত্যা করা হতো সেসব কারণে 'আজল' করা হতো না।

হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনটি কারণে আজল করা হতো।

প্রথমত– দাসীর গর্ভ থেকে নিজের কোন সন্তান জন্মানো এরা পছন্দ করতো না (কারণ সামাজিক মর্যাদায় দাসী পুত্র খাটো বিবেচিত হতো–অনুবাদক)।

দ্বিতীয়– দাসীর গর্ভে কারো সন্তান জন্মালে উক্ত সন্তানের মাকে হস্তান্তর করা যাবে না অথচ তারা স্থায়ীভাবে দাসীকে নিজেদের কাছে রেখে দিতেও প্রস্তুত ছিলো না।

তৃতীয়– দুগ্ধপায়ী শিশুর মা পুনরায় গর্ভ ধারণ করার ফলে প্রথম শিশুর স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা করা হতো।

এসব কারণে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোন সাহাবী আজল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এর বিরুদ্ধে কোরআন ও সুন্নাহতে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকায় আজল করেছেন। এরূপ আমলকারীদের মধ্যে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ), হযরত সায়াদ ইব্নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ও হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) প্রমুখ

নামধন্য সাহাবীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অন্যতম হযরত জাবের (রাঃ) হযরত রসূলে করীম (সঃ)–এর নীরবতাকেই সম্মতি ধরে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –

"আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)–এর জামানায় আজল করতাম।"

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ–

"কোরআন নাজিল হচ্ছিল যে জামানায় সে জামানায় আমরা আজল করতাম।"

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ–

"আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জামানায় আজল করতাম সে সময় কোরআনও নাজিল হচ্ছিল।"

এসব হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গে আরও যেসব সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত, তাঁরা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকাটাতেই জায়েজ হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এ সাহাবা প্রমুখদের বর্ণিত ভাষায় একটি হাদীস ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জামানায় আজল করতাম, হুজুর (সঃ) এ খবর জানতে পেরে আমাদের তা করতে নিষেধ করেন।"

এ হাদীসটির শব্দগুলোও অস্পষ্ট। হুজুর (স) কে আজল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয়েছিলো কিনা–আর প্রশ্ন করা হয়ে থাকলে তিনি কি জবাব দিয়েছেন, একথা স্পষ্টভাবে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না।

এ বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিষয়টি সম্পর্কে হুজুর (স) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ

আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এলো। আমরা আজল করলাম এবং এ সম্পর্কে হুজুর (সঃ)– কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেনঃ

তোমরা কি এরূপ কর?
তোমরা কি এরূপ কর??
তোমরা কি এরূপ কর???

"কেয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই।"

(বুখারী)

হযরত ইমাম মালেক (রঃ) 'মুয়াত্তা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই আবু সাইদ (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেনঃ

বনী মুসতালাকের যুদ্ধে আমাদের হাতে কতিপয় দাসী এলো। পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা আমাদের জন্যে খুবই কষ্টকর হচ্ছিলো। আমরা দাসীদের ভোগ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু এদের বিক্রি করার ইচ্ছাও আমাদের ছিলো। এ জন্যই আমরা আজল করতে মনস্থ করি যেন কোন সন্তান জন্মাতে না পারে। এ বিষয়ে আমরা হুজুর (স)–কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেনঃ

مَاعَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَفْعَلُوْا مَامِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ –

"তোমরা এরূপ না করলে কি ক্ষতি হবে? কেয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে তারা তো জন্মাবেই।"

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আঁ–হযরত (সঃ)- কে আজল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ

لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَّ تَفْعَلُوْا ذَالِكُمْ ٠

"তোমরা এরূপ না করলে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না।"

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ وَلِمَ يَفْعَلَ ذَالِكَ اَحَدُكُمْ ؟

"কেন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এরূপ করবে?"

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট এসে বলেন, "আমার একটি দাসী আছে এবং তার গর্ভে কোন সন্তান হোক তা আমি চাই না।" এর উত্তরে হুজুর (সঃ) বললেনঃ

اَعْزِلْ عَنْهَا اِنْ شِئْتَ فَاِنَّهُ سَيَاتِيْهَا مَاقُدِّرَلَهَا -

"তুমি ইচ্ছা করলে আজল করতে পার–তবে তার তক্‌দীরে যা লেখা আছে তা হবেই।"

এছাড়া ইমাম তিরমিজি হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা দীনী এলেমে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাঁরা সাধারণত 'আজল'কে মাকরূহ মনে করতেন। মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ইমাম মালেক (রঃ) বলেন

যে, হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম যাঁরা 'আজল' পছন্দ করতেন না

এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) আজলের অনুমতি দেননি, বরং একটা নিরর্থক ও অপছন্দনীয় কাজ মনে করতেন। আর যেসব সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের ব্যাপারে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তারাও এ বিষয়কে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু যেহেতু 'আজল' ক্রিয়ার স্বপক্ষে জাতির মধ্যে কোন আন্দোলন শুরু হয়নি এবং এটাকে জাতির জন্যে বিশেষ জরুরী বিষয় হিসেবেই পরিগণিত করার কোন প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায়নি, বরং অল্প কয়েকজন লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরিহার্য কারণে এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হবেন; সেজন্যেই হযরত (সঃ) এ বিষয়ে কোন সাধারণ নিষেধাজ্ঞাও প্রচার করেননি। ঐ সময় যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন শুরু হতো তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোরভাবে তাকে বাধা দিতেন।

'আজল'-এর মাপকাঠিতেই আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু এ জন্যে এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেননি যে, অনেক সময় অনেকেই বিবিধ ব্যক্তিগত কারণে জন্মনিরোধ করতে বাধ্য হয়। তাদেরকে প্রয়োজনের জন্যে এ কাজ করতে দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোন নারীর স্বাস্থ্য এমন পর্যায়ে থাকা যে, গর্ভসঞ্চার হলেই তার প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে, অথবা তার স্বাস্থ্য অস্বাভাবিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতৃ দুগ্ধপানে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। এ ধরনের অন্য অবস্থায়ও যদি চিকিৎসকের পরামর্শে নিছক স্বাস্থ্যগত কারণে কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন পথ গ্রহণ করেন তাহলে এর বৈধতা স্বীকৃত; এ কথা আমরা আগেও বলেছি। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণকে একটা সাধারণ কর্মসূচী ও জাতীয় পলিসিতে শামিল করা ইসলামী আদর্শের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। আর যেসব ভাবধারার ভিত্তিতে এ ধরনের কার্যসূচী গৃহীত হয় সেগুলোও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১নম্বর পরিশিষ্ট

ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা

(আবুল আ'লা মওদুদী)

এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে, "ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা।" বাহ্যত এ আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে শুধু সন্তানের জন্মসংখ্যাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ রাখার ইচ্ছা ও চেষ্টা এবং এর বাস্তব কর্মপন্থা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশাবলীর উল্লেখ করে প্রবন্ধকারের অভিমত অনুসারে ইসলামী বিধানমতে এ কাজ যায়েজ কিনা, তা বলে দেয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এত সংকীর্ণ পরিসরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টিও কঠিন। এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে জানা দরকারঃ

* প্রকৃতপক্ষে "পরিবার পরিকল্পনা" বিষয়টি কি?
* এর সূত্রপাত হলো কেন?
* আমাদের জীবনের কোন্ কোন্ দিক ও বিভাগের সঙ্গে এর কি ধরনের সম্পর্ক?
* এ পথে বাস্তব পদক্ষেপ্রের ফলে জীবনের বিভিন্ন দিকে কি কি প্রভাব পড়তে পারে?
* ব্যক্তিগতভাবে এর ইচ্ছা ও চেষ্টায় তদ্বিয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে একটি সমষ্টিগত আন্দোলন সৃষ্টি করার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি নেই? যদি থাকে তবে সে পার্থক্যটা কি এবং এর ভিত্তিতে উভয় প্রচেষ্টার মধ্যে কি কি নিয়ম-কানুনের পার্থক্য থাকা দরকার?

এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির পরই ইসলামের নির্দেশাবলীর গভীরে পৌছে এবং এর উদ্দেশ্য বুঝা সম্ভব হতে পারে। এ জন্যে আমি সর্বপ্রথম এসব বিষয়েই কয়েকটি জরুরী কথা বলবো।

সমস্যার ধরন

"পরিবার পরিকল্পনা" কোন নূতন বিষয় নয় বরং একটি অতি পুরাতন ধারণার নূতন নাম মাত্র। মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে মানুষ তার বর্ধিত বংশধরের হার ও দুনিয়ার উপকরণাদির পরিমাণ তুলনা করে আশঙ্কা করেছে যে, জনসংখ্যা বিনা বাধায় বাড়তে দিলে তাদের বসবাসের স্থান ও খাদ্যের অভাব দেখা দেবে। পুরাতন জামানার মানুষ এ আশঙ্কাটি অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রকাশ

করতো। আধুনিক যুগের মানুষ রীতিমত হিসেব করে বলে দিচ্ছে আবির্ভাবের সতেরো শ' বছর পর পর্যন্তও মানুষ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি যে, অষ্টদশ শতকের মাঝামাঝি এ বাষ্প থেকেই রেজেকের অসংখ্য উৎসে আবিষ্কৃত হবে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ জ্বালানী তৈল ও এর দাহিকা শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কেউ এ কথা জানতো না যে, অচিরেই পৃথিবীর বুক চিরে পেট্রোলের প্রস্রবন বের হয়ে আসবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মোটর, বিমান, শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নয়া মোড় পরিবর্তন করে দেবে। স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষ ঘর্ষণের ফলে অগ্নিস্ফুলিংগ সৃষ্টি হতে দেখেছে কিন্তু হাজার হাজার বছর পর ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে এসে বিদ্যুতের রহস্য মানুষের কাছে ধরা পড়েছে এবং এর ফলে শক্তির এক বিপুল ভাণ্ডার মানুষের হস্তগত হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে মাত্র দেড় শত বছর আগে মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেনি। পুনরায় অণু (Atom) বিশ্লেষণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্মের বহু বছর পূর্ব থেকেই বিতর্ক চলে আসছিল। কিন্তু কে জানতো যে, বিংশ শতকে এসে এ ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অণু বিস্ফোরিত হবে এবং এর গর্ভ থেকে এত বিপুল শক্তি বের হয়ে আসবে যে, এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞাত সকল শক্তি এর তুলনায় নগণ্য মনে হবে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও এর উপকরণাদির মধ্যে উপরোল্লিখিত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে গত দু'শ বছরের মধ্যে এবং এসব পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে জীবনযাপনের বস্তুসামগ্রী ও উপকরণাদি এত বেড়ে গিয়েছে যে, মানুষ খৃষ্টীয় আঠারো শতকের স্বপ্নেও তা ধারণা করতে পারতো না। এসব আবিষ্কারের পূর্বেই যদি কেউ তৎকালীন দুনিয়ার উপায়–উপকরণের হিসেব করে জনসংখ্যাকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করার পরিকল্পনা করতো তাহলে সেটা যে কত বড় মূর্খতার কাজ হতো তা চিন্তা করে দেখা উচিত।

এ ধরনের হিসেব যারা করে, তারা শুধু যে বর্তমান সময়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে ভবিষ্যতের জন্যেও যথেষ্ট মনে করার ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হয় তাই নয় বরং তারা এ কথাও ভুলে যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শুধু খাদ্য গ্রহণকারীর সংখ্যাই বেড়ে যায় না বরং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও উপার্জনকারীর সংখ্যাও বাড়ে। অর্থনীতির নিয়মানুসারে তিনটি বিষয়কে উৎপাদনের উৎস মনে করা হয়। এ তিনটি হচ্ছে জমি, পুঁজি এবং জনশক্তি। এ তিনটির মধ্যে আসল ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনবল। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার দুশ্চিন্তায় যারা দিশে হারিয়ে ফেলেন তারা মানুষকে

উৎপাদনকারীর পরিবর্তে নিছক সম্পদ ব্যবহারকারী হিসেবেই গণ্য করেন এবং সম্পদ উৎপাদনকারী হিসেবে জনশক্তির ভূমিকাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে থাকেন। তারা এ কথা চিন্তাও করেন না যে, মানবজাতি অতিরিক্ত জনসংখ্যাসহ বরং তার বদৌলতেই এ পর্যন্তকার যাবতীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যা শুধু যে নয়া নয়া কর্মক্ষেত্রের দ্বার খুলে দেয় তাই নয় বরং কাজের তাগিদও সৃষ্টি করে থাকে। প্রতিদিন বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হওয়াই হচ্ছে বর্তমান উপায়-উপকরণের সম্প্রসারণ, নয়া উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান এবং জীবনের সকলক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা করার কঠোর তাগিদ। এ তাগিদের দরুনই পতিত জমিতে চাষাবাদ করতে হয়। বালিয়াড়ি, ঝোপঝাড় ও সমুদ্রের তলদেশ থেকে কৃষিযোগ্য জমি বের করা হয়, চাষাবাদের নয়া নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়, মাটি খুঁড়ে সম্পদ বের করা হয়। মোটকথা বাড়তি জনসংখ্যার চাপেই মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে নিজেদের চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যায়- জীবনযাপনের উপকরণ অনুসন্ধানের কাজে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। এ তাগিদের অবর্তমানে অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা এবং উপস্থিত ও বর্তমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কি-বা হাসিল হতে পারে? সন্তানের বাড়তি সংখ্যাই তো একদিকে মানুষকে বেশী বেশী কাজ করতে বাধ্য করে এবং অপরদিকে কর্মক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্মী আমদানী করে থাকে।

বাড়তি জনসংখ্যা কি সত্যিই অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ?

জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণাদির হার মানব বংশ বৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কম বলে যারা দাবী করেন, তাদের উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের কাছে অতি নিকট অতীতের যেসব তথ্য আছে তাই যথেষ্ট।

১৮৮০ সালে জার্মানীর জনসংখ্যা ছিল, ৪,৫০,০০০,০০ (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ)। ঐ সময় সে দেশের লোক খাদ্যাভাবে মরণ বরণ করছিল এবং হাজার হাজার অধিবাসী দেশ ত্যাগ করে অন্যান্য দেশে চলে গিয়েছিল। এরপর মাত্র ৩৪ বছরের মধ্যে জার্মানীর জনসংখ্যা ৬,৮০,০০,০০০ (ছয় কোটি আশি লক্ষ) পৌছে যায় এবং এ সময়ে জার্মানীর অধিবাসীদের অর্থনৈতিক দুর্গতি বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অর্থনৈতিক উপকরণ কয়েক শত গুণ বেশী বেড়ে যায়। এমনকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে ভিন্ন দেশ থেকে লোক আমদানী করতে হয়। ১৯০০ সালে ৮ লক্ষ বিদেশী জার্মানীতে কার্যরত ছিল। ১৯১০ সালে এদের সংখ্যা ১৩ লক্ষে পৌছে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পশ্চিম জার্মানীর যে অবস্থা হয়েছে তা আরও আশ্চর্যজনক।

সেখানে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ছাড়াও পূর্বজার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভিয়া এবং অন্যান্য কমিউনিষ্ট কবলিত অঞ্চল থেকে জার্মান জাতির প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লোক মুহাজির হয়ে এসেছে এবং আজ পর্যন্তও প্রতিদিন শত শত লোক আসা অব্যাহত আছে। এ দেশের আয়তন মাত্র ৯৫ হাজার বর্গমাইল এবং এর অধিবাসীদের সংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষের উপরে পৌছে গেছে। এ অধিবাসীদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন মুহাজির এবং কাজের অযোগ্যবিধায় ৬৫ লক্ষ লোক পেন্সনভোগী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে এবং যুদ্ধ পূর্বকালীন অবিভক্ত জার্মানীর মোট সম্পদের চাইতেও এর বর্তমান সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশী। এ দেশ মানুষ বৃদ্ধির জন্যে নয়, মানুষের সংখ্যাল্পতার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং কার্যোপযোগী যত মানুষ আছে সকলকে কাজে নিয়োজিত করেও আরও মানুষ চাচ্ছে।

হল্যাণ্ডের অবস্থা দেখুন। আঠারো শতকে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ ছিল; দেড় শ' বছরের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে ১৮৫০ সালে ১ কোটির উপরে পৌছে গেছে। মাত্র ১২,৮৫০ বর্গমাইলের মধ্যেই এসব মানুষ বসবাস করে। এদের চাষাবাদ যোগ্য জমি গড়ে জনপ্রতি এক একরও হয় না। কিন্তু এদেশ আজ শুধু যে নিজেরই প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম তাই নয়, উপরন্তু দেশটি বিপুল পরিমাণ খাদ্যোপকরণ বিদেশে রফতানী করছে। তাহা সমুদ্রকে পিছনে দিয়ে এবং কর্দম শুকিয়ে দু'লক্ষ একর জমি বের করে নিয়েছে এবং আরও তিন লক্ষ একর বের করে নেবার চেষ্টা করছে। দেড় শ' বছর পূর্বে এ দেশের যে সম্পদ ছিল তার পরিমাণ এর বর্তমান সম্পদের তুলনায় কিছুই নয়।

এখন ইংলণ্ডের অবস্থা দেখা যাক। ১৭৮৯ সালে বৃটেন ও আয়াল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ ছিল। ১৯১৩ সালে এ সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ এবং বর্তমানে পূর্ব আয়ারল্যাণ্ড পৃথক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ৫ কোটি ২৬ লক্ষ হয়ে যায়। জনসংখ্যার এই পাঁচগুণ বৃদ্ধির ফলে বৃটেনের অধিবাসীগণ পূর্বের চাইতে অধিকতর দরিদ্র হয়ে গেছে বলে কি কেউ বলতে পারে?

সমগ্র দুনিয়ার অবস্থা একবার দেখা যাক। আঠারো শতকের শেষের দিকে দুনিয়ার জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়েছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী হারে সম্পদ উৎপাদনের উপকরণ বেড়েছে। আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যে সব জিনিস ব্যবহার করে থাকে দু'শো বছর পূর্বের বাদশাহদের ভাগ্যেও তা জোটেনি। বর্তমান কালের জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে দু'শো বছর পূর্বের জীবন যাত্রার মানের কোন তুলনাই হতে পারে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার যথার্থ সমাধান

উপরে যে সব দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো– তা থেকে একথা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, জনসংখ্যাকে হ্রাস করে অথবা এর বৃদ্ধি রোধ করে অর্থনৈতিক উপাদানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা সমস্যার সঠিক সমাধান নয়। এ ব্যবস্থার ফলে সঙ্গতি সৃষ্টি হবার পরিবর্তে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।

এর পরিবর্তে জীবন যাপনের উপকরণ বাড়ানো এবং নয়া নয়া উপকরণ খুঁজে বের করার জন্যে আরও চেষ্টা করাই হচ্ছে এর প্রকৃত সমাধান। এ পন্থাকে যেখানেই পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানেই জনসংখ্যা ও উপকরণের মধ্যে শুধু যে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে তাই নয়, বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উপকরণ ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশী পরিমাণে।

এ পর্যন্ত আমি শুধু জীবিকা ও এর অগণিত উপকরণ সম্পর্কে বলেছি যা মানুষের স্রষ্টা (খোদাকে অস্বীকারকারীদের মতে 'প্রকৃতি') পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে মওজুদ রেখেছেন। এখন আমি সংক্ষেপে মানুষ ও তার বংশ বৃদ্ধি সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই যেন সত্য সত্যই আমরা এ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা করার যোগ্য কিনা তাও বিচার করে দেখা সহজ হয়।

মানব বংশের প্রকৃত পরিকল্পনাকারী কে?

এ দুনিয়াতে সম্ভবত একজন মানুষও একথা বিশ্বাস করে না যে, সে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ মোতাবেক জন্ম নিয়েছে। আর এ–ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে আসার ব্যাপারে মানুষের নিজের পছন্দ–অপছন্দ বা ইচ্ছা–অনিচ্ছা যেমন কিছু আসে যায় না ঠিক তেমনি এ ব্যাপারে তার মাতা–পিতার এখতিয়ারও নাম মাত্র। বর্তমান দুনিয়ার বাস্তব পরীক্ষা–নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, পুরুষের প্রতিবার বীর্যপাতের সময় তার দেহ থেকে ২২ কোটি থেকে ৩০ কোটি শুক্রকীট বের হয়ে যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ৫০ কোটি শুক্রকীট প্রতিবার নির্গত হয়ে যাবার কথাও বলেছেন। এ কোটি কোটি শুক্রকীটের প্রত্যেকটি স্ত্রী ডিম্ব কোষে প্রবেশ করার সুযোগ পেলে এক একটি পূর্ণ মানুষের পরিণত হতে পারে। এদের প্রতিটি কীট পৈতৃক গুণাবলী ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অপরদিকে একজন সাবালিকা নারীর ডিম্বকোষে প্রায় ৪ লক্ষ অপরিপক্ক ডিম্ব মওজুদ থাকে। তন্মধ্যে প্রতি তোহরে (অর্থাৎ দুই মাসিক ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে) একটি মাত্র ডিম্ব পূর্ণতা লাভ করে (সাধারণত মাসিক ঋতুর ১৪ দিন পূর্বে) ডিম্বকোষ থেকে বের

হয়ে সর্বাধিক ২৪ ঘন্টা কালের মধ্যে কোন পুরুষের শুক্রকীট পেলে তাকে গ্রহণ করে গর্ভ সঞ্চার করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। ১২ বছর বয়স থেকে ৪৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৩৬ বছর সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি নারীর ডিম্বকোষ গড়ে ৪৩০ টি পূর্ণাবয়ব ও ফল দানে সক্ষম ডিম্ব নির্গত করে থাকে। এ সব ডিম্বের প্রত্যেকটি মাতৃত্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর দিক থেকে পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। নর ও নারীর প্রতিবারে বীর্যপাতের সময় পুরুষের দেহ থেকে চঞ্চল শুক্রকীট বের হয়ে নারীর ডিম্বের সন্ধানে ছুটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু কোন সময় হয়তো ডিম্বকোষ থেকে পরিপক্ক ডিম্ব বের হয়ে না আসার দরুন এরা ব্যর্থ হয়। আবার কোন সময় এসব শুক্রকীটের সব কয়টি ডিম্ব পর্যন্ত পৌছতে ব্যর্থ হয়। অনুরূপভাবে প্রতিটি নারী ডিম্বকোষ থেকে প্রতি তোহরে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের একটি মাত্র ডিম্ব নির্গত হয়ে ২৪ ঘন্টা পুরুষের শুক্রকীটের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু এ সময়ে হয়তোবা পুরুষের কোন বীর্যপাতই হয় না অথবা হয়ে থাকলে এর নিঃসৃত শুক্রকীটগুলো ডিম্ব পর্যন্ত পৌছতে পারে না। এভাবেই অসংখ্য বীর্যপাত এমনকি কারো কারো জন্যে সমগ্র জীবনের বীর্যপাত ব্যর্থ হয়ে যায়। পুরুষের কোটি কোটি শুক্রকীট এবং নারীর শত শত ডিম্ব এভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কখনও কখনও এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন পুরুষের শুক্রকীট যথার্থই নারীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে যায় এবং এভাবে গর্ভ সঞ্চার হয়।

এটা হলো মানুষ সৃষ্টির আল্লাহ্-র ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য মনোযোগ সহকারে নজর করলেই এতে আমাদের পরিকল্পনা করার অধিকার কতটুকু আছে তা বোঝা যাবে। কোন মা-বাপ, ডাক্তার বা সরকারের পক্ষে এক দম্পত্তির অসংখ্যবার যৌন মিলনের মধ্য থেকে কোন এক বিশেষ সময়ের বীর্যপাতকে সন্তান জন্মানোর জন্যে বাছাই করে নেবার কোন ক্ষমতা নেই। পুরুষের কোটি কোটি শুক্রকীট থেকে কোন একটিকে নারীর শত শত ডিম্বের কোনটির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং এ দুয়ের মিলনের ফলে কোন্ ধরনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সন্তান জন্মাবে, এসব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করা তো দূরের কথা -মানুষ জানতেও পারে না যে, কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় এবং তার গর্ভে যে শিশু আসছে তার মধ্যে কোন্ কোন্ গুণাবলীকে একত্র করা হচ্ছে। এসব তো একমাত্র তাঁরই কাজ যাঁর ইঙ্গিতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক উর্ধ্বে আল্লাহ্র সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে কার্যকরী হচ্ছে এবং এর পরিচালনা কার্যে আল্লাহ ছাড়া আর করো কোন হাত নেই। তিনিই গর্ভ সঞ্চারের সময় নির্ধারণ করেন, তিনিই বিশেষ শুক্রকীটকে বিশেষ ডিম্বের সঙ্গে মিলনের জন্যে মনোনীত করে থাকেন এবং নর নারীর বাঞ্ছিত মিলনের ফলে পুত্র অথবা কন্যা, সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ

অথবা অপূর্ণ ও বিকলাংগ, সুশ্রী অথবা বিশ্রী, বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ, যোগ্য বা অযোগ্য ইত্যাদি কোন্ ধরনের সন্তান জন্মানো হবে এ ফয়সালাও একমাত্র তিনিই করে থাকেন। এ সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে শুধু নিজেদের দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্যে যৌনমিলন ও সন্তান জন্মানোর যন্ত্রটিকে সক্রিয় করে নেয়ার দায়িত্বটুকু মাত্র মানুষকে দেয় হয়েছে। এর পরবর্তী যাবতীয় কাজ স্বয়ং স্রষ্টার কর্তৃত্বাধীন।

মানব বংশের প্রকৃত পরিকল্পনা উল্লিখিত সৃষ্টি ব্যবস্থার মাধ্যমেই করা হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একদিকে মানুষের মধ্যে এত প্রবল প্রজনন শক্তি রয়েছে যার ফলে একজন মানুষের দেহ থেকে একবার যে পরিমাণ বীর্য স্খলন হয় তা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কয়েক গুণ বেশি মানুষের জন্ম দিতে পারে। কিন্তু অপর দিকে এ প্রবল প্রজনন শক্তিকে কোন বিশেষ উচ্চতর শক্তি এতটুকু সীমাবদ্ধ করে রেখেছে যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছরে মানুষের মোট সংখ্যা মাত্র তিন অর্বুদ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। আপনি নিজেই হিসাব করে দেখুন। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার সাল থেকে যদি একজন মাত্র পুরুষ ও একজন নারীর সন্তান-সন্ততিকে স্বাভাবিক হারে বেড়ে যেতে দেয়া হতো এবং প্রতি ৩০/৩৫ বছর সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতো তাহলে একটিমাত্র দম্পতির বংশধর আজ পর্যন্ত এত বিপুল সংখ্যক হয়ে দাঁড়াতো যে, তা লিখে প্রকাশ করার জন্যে ২৬ অংকের একটি রাশির দরকার হতো। কাজেই প্রশ্ন ওঠে যে, মানুষের স্বাভাবিক জন্মহার মুতাবিক তাদের বংশধর যে বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল তা একমাত্র স্বয়ং স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া আর কার পরিকল্পনায় এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে রয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র শক্তিশালী পরিকল্পনাই মানুষকে পৃথিবীতে এনেছে এবং কখন কত সংখ্যক সৃষ্টি করা হবে এবং কি হারে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে, এসব বিষয়ও ঐ পরিকল্পনার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ঐ একই শক্তিমান পরিকল্পনাকারী প্রত্যেক পুরুষ ও নারী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কে কে কোন্ কোন্ আকৃতি, কোন্ কোন্ শক্তি ও কোন্ কোন্ যোগ্যতাসহ জন্মাবে; কে কি অবস্থায় লালিত-পালিত হবে এবং কে কি পরমাণ কাজ করার সুযোগ পাবে। কোন্ সময় কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ জাতিকে কি পরিমাণ বেড়ে যেতে দেয়া হবে এবং কোথায় পৌঁছাবার পর এর বৃদ্ধি বন্দ অথবা হ্রাস করতে হবে, এসব বিষয়ও একমাত্র তিনিই নির্ধারণ করেন। তাঁর এ পরিকল্পনা বুঝে ওঠা বা এতে রদবদল করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তবুও যদি আমরা এতে হস্তক্ষেপ করি, তাহলে তা অন্ধকারে তীর নিক্ষেপ করার শামিল হবে। কেননা এই বিশাল বিস্তৃত কারখানাটি যিনি পরিচালিত করেন তাঁর প্রকাশ্য অংশটুকুও পূর্ণরূপে দেখার যোগ্যতা আমাদের নেই। তাঁর গোপন

নেই। তাঁর গোপন পরিকল্পনায় পৌঁছার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় তথ্য না জানার দরুন সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

কেউ কেউ হয়তো আমাদের এসব উক্তিকে ধর্মীয় ভাবাবেগ আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন এবং জোরেশোরে প্রশ্ন করবেন যে, আমাদের অর্থনৈতিক শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে সন্তান সংখ্যাকে সঙ্গতিশীল করবো না কেন বিশেষত স্বয়ং আল্লাহ্ই যখন এ কাজ করার উপযোগী নানাবিধ তথ্য ও যন্ত্রপাতি আমাদের অধীন করে দিয়েছেন? তাই, এবার জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার কি কি কুফল দেখা দিতে পারে এবং যে যে স্থানে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে সেখানে এর কি ফলাফল দেখা দিয়েছে, তা'এবার পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করবো।

জনসংখ্যার পরিকল্পনার পরিবর্তে পরিবার পরিকল্পনা কেন?

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম জানা দরকার যে, পরিবার পরিকল্পনার সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে জন সংখ্যার পরিকল্পনা দাবি করে পরিবার পরিকল্পনা নয়। অন্য কথায় এ বিষয়ে পেশকৃত যাবতীয় যুক্তি গ্রহণ করে নিলে একদিকে দেশের অর্থনৈতিক উপকরণাদির সঠিক হিসাব গ্রহণ এবং অপরদিকে এ উপকরণাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনসংখ্যা কি পরিমাণ থাকা দরকার ও যারা মরে যায় তাদের স্থানে কত সংখ্যক নতুন শিশু জন্মানো প্রয়োজন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা সফলতা লাভ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না বিয়ে ও পরিবারের ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে পুরুষ ও নারীকে সরকারের মজুর শ্রেণীতে পরিণত করা হয়। এসব মজুর নর–নারীর দল এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক নিছক সন্তান জন্মানোর উদ্দেশ্যে সরকারী ডিউটি পালনের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে এবং বাঞ্ছিত সংখ্যক নারীর গর্ভসঞ্চারের পর সকল নারী ও পুরুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এছাড়া অন্য এক উপায়েও পরিকল্পনার রূপদান করা যেতে পারে। এ পরিকল্পনায় পুরুষ ও নারীর সরাসরি মিলন নিষিদ্ধ করে দিতে হবে এবং 'রক্ত ব্যাঙ্কে'র মত কৃষি ব্যাঙ্ক কায়েম করে নারীদের গরু মহিষ ও ঘোড়ার মতই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক গর্ভবতী করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ দু'টি পথ ছাড়া জনসংখ্যাকে পরিকল্পনাধীনে আনার জন্য কোন পথ নেই।

যেহেতু মানুষ এখনও এতটা অধপতন মেনে নিতে রাজী নয়, সেজন্যেই বাধ্য হয়ে জনসংখ্যা পরিকল্পনার পরিবর্তে পরিবার পরিকল্পনার পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সন্তান 'গৃহ' নামক স্বাধীন ও ক্ষুদ্র কারখানায়ই জন্মানো হবে

এবং এদের জন্ম ও প্রতিপালকের দায়িত্বও একজন মাতা ও একজন পিতার হাতেই ন্যস্ত থাকবে, তবে এ স্বাধীন কারখানার মালিকদের স্বেচ্ছায় তাদের উৎপাদন কমিয়ে দেবার জন্যে উৎসাহিত করা হবে।

পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ

উল্লিখিত উদেশ্য হাসিল করার জন্যে মাত্র দু'টি পথই গ্রহণ করা যেতে পারে– আর তাই গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রথম পন্থা হচ্ছে, জনগণের ব্যক্তিগত স্বার্থের দোহাই দিয়ে তাদের নিকট জন্ম নিরোধের আবেদন জানানো এবং প্রচার মারফত তাদের মনে এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি করা যেন তারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার মানের অবনতি না ঘটায়। তাদের বুঝতে হবে, যেন তারা নিজেদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জন্যে এবং সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যতের খাতিরে কম সংখ্যক সন্তান জন্মায়। এ ধরনের আবেদন করার কারণ এই যে, আজাদ মানুষকে নিছক সমষ্টিগত কল্যাণের খাতিরে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজে নিজে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্যে তৈরী করা সম্ভব হয় না। তাই এদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ধুয়া তোলা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, নর–নারীর পরস্পরের সম্ভোগ সুখ উপভোগের পথ বহাল রেখে সন্তানের জন্ম বন্ধ করার উপযোগী তথ্য ও উপকরণাদি ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে দেয়া, যেন সকলের জন্যেই তা সহজলভ্য হয়।

এ পরিকল্পনার ফলাফল

উল্লেখিত দু'ধরনের পরিকল্পনার যে ফলাফল প্রকাশিত হয় তা আমি ক্রমিক নম্বর অনুসারে পেশ করছিঃ–

১. জনসংখ্যা হ্রাস

এ উভয় পরিকল্পনার পদ্ধতির ফলাফল কখনও বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। জনসংখ্যাকে পরিকল্পিত উপায়ে বাড়াতে হলে দেশের অর্থনৈতিক উপায়–উপাদান হিসাব করে আমাদের কি হারে শিশু জন্মানো দরকার তা নির্ধারণ করতে হবে যেন জনসংখ্যা বাঞ্ছিত সীমারেখার আওতায় থাকে। কিন্তু কত সন্তান জন্মাবে এ ফয়সালা করার ভার যখন আজাদ স্বামী–স্ত্রীর মর্জির ওপর ছেড়ে দিতে হয় এবং তারা যখন দেশের উপায়–উপাদানের পরিমাণ হিসাব না করে শুধু নিজেদের সুখ–সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন তারা যে, দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে সন্তানের সংখ্যা স্থির করবে তার কোনই নিশ্চয়তা নেই।

এ অবস্থায় বেশী যা আশঙ্কা করা যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে, এদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও উচ্চমানের জীবন যাপনের লোভ যে পরিমাণে বাড়তে থাকবে, ঠিক সে অনুপাতে এদের সন্তানের সংখ্যা কমে যেতে থাকবে। ফলে এমন এক সময় আসবে যখন জাতির জনসংখ্যা বেড়ে যাবার পরিবর্তে কমে যাওয়া শুরু হবে।

ওপরে যা বলা হলো তা নিছক সম্ভাব্য ফল নয়, বরং বাস্তবে ফ্রান্সে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দুনিয়ার মধ্যে ফ্রান্সই সর্ব প্রথম ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় ও পদ্ধতিকে পরীক্ষা করেছে। সেখানে উনিশ শতকের শুরু থেকেই এ আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে। এক শত বছর সময়ের মধ্যে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, প্রতিটি জেলায় মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার কমে যেতে থাকে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ২১ বছর সময়ের মধ্যে ৭ বছর এমন অবস্থা ছিল যে, ফ্যান্সের মোট মৃত্যু সংখ্যা থেকে জন্মসংখ্যা ১ লখ ৬৮ হাজার কম ছিল। ১৯১১ সালের তুলানায় ১৯২১ সালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ২১ লাখ কম হয়ে যায় এবং ১৯৩২ সালে ফ্রান্সের মোট ৯০টি জেলার মধ্যে মাত্র ১২টি জেলায় জন্মহার মৃত্যুর হারের চেয়ে সামান্য বেশী ছিল। ১৯৩৩ সালে এ ধরনের জেলা মাত্র ৬টি ছিল অর্থাৎ সে বছর ফ্রান্সের ৪৮টি জেলায় নবজাতকদের সংখ্যা মৃত্যুবরণকারীদের তুলনায় বেশী ছিল। এ নির্বুদ্ধিতার দুরুনই দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, বিশ্বের দরবারে তার সকল প্রভাব প্রতিপত্তির সমাধি রচিত হয়।

কাজেই প্রশ্ন হচ্চে, ৮/৯ কোটি অধিবাসীর একটি দেশে ১ অর্বুদ ২৮ কোটি লোক অধ্যুষিত চারটি দেশ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় ফ্রান্সের মত বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে কি, বিশেষত পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে নিজের বা অন্যের বিবাদের দরুন যখন সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয় তখন জনসংখ্যা হ্রাস করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

২. নৈতিক পতন

ব্যক্তিগত স্বার্থের দোহাই দিয়ে সন্তান সংখ্যা কমানোর যে আবেদন সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হবে, তার প্রভাব শুধু সন্তান কমানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। একবার আপনি মানুষের চিন্তার ধারা বদলিয়ে দিন। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, তার উপার্জনলব্ধ সম্পদের যত অধিক সম্ভব অংশ তার নিজের আরাম-আয়েশেই নিয়োজিত হওয়া উচিত এবং যারা উপার্জন করতে পারে না, সম্পদ ব্যবহার করার ব্যাপারে তাদের অংশ গ্রহণ সহ্য করা উচিত নয়। এ মনোভাব সৃষ্টি করে দেবার পর দেখতে পাবেন, শুধু যে নতুন নতুন সন্তানের জন্মই তার কাছে অসহনীয় মনে হবে তাই নয়, বরং নিজের বুড়ো বাপ-মা ও এতিম ভাই-বোন সবই তার কাছে অসহ্য মনে হবে; যে

সকল পুরাতন রোগীর রোগ মুক্তির আশা নেই- বিকলাঙ্গ, অকর্মণ্য আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি যারা উপার্জনের অযোগ্য তাদের কারো জন্যে নিজের সম্পদ ব্যয় করতে উপার্জনকারী প্রস্তুত হবে না। কারণ এরূপ করলে তার নিজের জীবন যাত্রার মান নীচে যাবে বলে সে বিশ্বাস করবে।

যারা নিজেদের সন্তানের বোঝা বইতে পর্যন্ত রাজী নয় এবং শুধু এজন্যেই দুনিয়ায় আগমনকারীদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় তারা কেমন করে এমন সব লোকের বোঝা বইতে রাজী হতে পারে, যারা আগে থেকেই দুনিয়ায় আগমন করেছে এবং নিজেদের সন্তানের তুলনায় ভালবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর দূরে অবস্থান করে। এভাবেই এ ধরনের মনোভাব আমাদের নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে দেবে, আমাদের জনগণকে স্বার্থপর করে তুলবে এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা, সমবেদনা ও পরোপকারের প্রেরণা নির্মূল করে দেবে।

এ ফলাফলও নিছক ধারণা ও অনুমানভিত্তিক নয়, বরং যেসব সমাজে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে ওপরে বর্ণিত সব কিছুই মওজুদ রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বুড়ো মা-বাপের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয় এবং ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের বিপদ-আপদে যে ধরনের খোঁজ-খবর নেয়া হয়, তা আজ কে না জানে?

৩. ব্যভিচারের আধিক্য

জন্মনিরোধ আন্দোলনকে সার্থকরূপে বাস্তবায়নের জন্যে জন্মনিরোধ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর অবাধ প্রচার ও এর উপকরণাদি সর্বত্র সহজলভ্য করে দেয়ায় শুধু যে বিবাহিত দম্পত্তিই এগুলো ব্যবহার করবে তার নিশ্চয়তা কি? প্রকৃতপক্ষে বিবাহিত দম্পত্তির তুলনায় অবিবাহিত বন্ধুযুগলই এ ব্যবস্থা দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে এবং ব্যভিচার এত প্রসার লাভ করবে যে, আমাদের ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। যে সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কিত শিক্ষার অনুপাত দিন দিন ক্ষীণতর হয়ে আসছে, যেখানে সিনেমা, অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল ছবি, গান ও যৌন আবেদনমূলক অন্যান্য কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, যেখানে পর্দার কড়াকড়ি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং নর-নারীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে নারীদের পোশাকে উলংগপনা, রূপচর্চা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনেচ্ছা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, যেখানে একাধিক বিয়ে করার পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে কিন্তু পর-পুরুষ ও নর-নারীর অবৈধ মিলনের পথে কোনো আইনগত অসুবিধা থাকছে না, যেখানে ১৬ বছরের নিম্ন বয়স্কা বালিকার বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ, সেখানে নৈতিক অধপতন থেকে রক্ষা করার একটি মাত্র পথই বাকী থাকে -আর তা হচ্ছে অবৈধ

গর্ভ সঞ্চারের আশঙ্কা। একবার এ বাধাটুক অপসারণ করে দিন এবং বদ স্বভাববিশিষ্ট নারীদের নিশ্চয়তা দান করুন যে, গর্ভ সঞ্চারের আশঙ্কা না করেই তারা নিশ্চিন্তে নিজেদেরকে পুরুষ বন্ধুর নিকট সোপর্দ করে দিতে পারে, তারপরে দেখবেন যে, ব্যভিচারের সর্বগ্রাসী বন্যায় সমাজ এমনভাবে প্লাবিত হয়ে যাবে যে, এর প্রতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই।

এ কুফলও নিছক অনুমানভিত্তিক নয়, বরং দুনিয়ায় যেসব দেশে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়েছে সেসব দেশে ব্যভিচার এমনভাবে বেড়েছে যে, ইতিহাসে তার কোন নজির পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও এজন্যে সমষ্টিগত আন্দোলন

পরিবার পরিকল্পনাকে একটি ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত করায় ওপরে বর্ণিত তিনটি পরিণতি থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই। যদি জন্মরোধকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থার চাহিদা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং কোন বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সংগত কারণে এর প্রয়োজন অনুভব করে, একজন আল্লাহ্ ভীরু দীনী আলেম এদের বর্ণিত প্রয়োজনকে বৈধ মনে সতর্কতার সঙ্গে জায়েজ হবার সপক্ষে ফতওয়া দেন এবং শুধু একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মারফতই জন্মনিরোধের সরবরাহ করা হয় তাহলে ইতিপূর্বে আমি যেসব সামষ্টিক ক্ষতি উল্লেখ করেছি তার উদ্ভবের কোন সম্ভাবনাই দেখা দিতে পারে না। কিন্তু এ সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্মনিরোধ সমষ্টিগত পর্যায়ে পরিচালিত আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের হয়। কেননা উক্ত আন্দোলন মারফত জন্মনিরোধের উপকরণগুলো সরাসরি প্রত্যেক লোকের নাগালের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত কুফলসমূহ প্রতিরোধ করা কারো আয়াসসাধ্য নয়।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

এ আলোচনার পর আমরা যে দীনের অনুসারী সে এ বিষয়ে আমাদের কি কি পথনির্দেশ দান করে তা প্রকাশ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। সাধারণত জন্মনিরোধের সমর্থকবৃন্দ যেসব হাদীস থেকে 'আজল' (সঙ্গমকালে চরম মূহূর্তে বীর্য স্ত্রীঅঙ্গের বাইরে নিক্ষেপ)-এর বৈধতা প্রমাণ করে দেখান তারা ভুলে যান যে, ঐসব হাদীসের পটভূমিকায় বংশ বৃদ্ধি নিরোধ করার কোন আন্দোলন কার্যকরী ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট জন্ম নিরোধের কোন আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে কেউ ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন নি। বরং বিভিন্ন সময় কেউ কেউ নিছক ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন জানতে চেয়েছিলেন যে, ঐ অবস্থায় একজন মুসলমানের জন্যে আজল করা জায়েয কি না? এসব বিভিন্ন ধরনের

প্রশ্নকারীদের উত্তর দান প্রসঙ্গে তিনি কাকেও নিষেধ করেছেন, কারো বেলায় এটাকে অপ্রয়োজনীয় কাজ আখ্যা দিয়েছেন এবং হুজুর (সঃ)–এর কোন কোন উত্তর অথবা কোন ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন থেকে আজলকে জায়েয বলে ধরে নেয়ার ধারণাও পাওয়া যায়। এসব পশ্নোত্তর থেকে শুধু বৈধতার জবাবগুলোকেও যদি বাছাই করে একত্রিত করে নেয়া যায় তবু শুধু ব্যক্তিগত কারণেই জন্মনিরোধকে বৈধ করা যেতে পারে। একটি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করার সপক্ষে এসব হাদীসকে দলিলরূপে ব্যবহার করার কোন উপায় নেই। আর ব্যক্তিগত জন্মনিরোধ ও গণ আন্দোলন মারফত জনসংখ্যা হ্রাস করার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তা একটু আগেই আমি উল্লেখ করেছি। এ পার্থক্যটি উপেক্ষা করে একের বৈধতাকে অপরের জন্যে দলিল হিসেবে পেশ করার অর্থ জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর জনসংখ্যা কমানোর জন্যে সমষ্টিগত আন্দোলন সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের ধারার গোড়া থেকে শুরু করে এর কার্যক্রম ও ফলাফল সবই ইসলামী আদর্শের সঙ্গে পূর্ণত সংঘর্ষশীল। এ চিন্তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, মানুষের সংখ্যা বেশী হলে রেজেকের অভাব দেখা দেবে এবং মানুষের জীবন ধারণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু কোরআন বার বার বিভিন্ন ধরনের মানুষের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, সৃষ্টি করেছেন যিনি, রেজেক দানের দায়িত্বও তাঁরই। তিনি এরূপ এলোপাতাড়ি সৃষ্টি করে যান না যে, কেবলি সৃষ্টি করে চলেছেন, অথচ যে পৃথিবীতে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে, সেখানে তাদের জীবন যাপনের উপযোগী মাল–মসলা মওজুদ আছে কিনা সেদিকে মোটেই লক্ষ্য করছেন না এবং তিনি রেজেকের ভার অন্য কারো ওপর অর্পণ করেন নি যে, সৃষ্টির কাজ তিনি করে যাবেন এবং রেজেকের সংস্থান অন্য কেউ করতে থাকবে। তিনি শুধু খালেকই (স্রষ্টা) নন, রাজ্জাকও (রেজেকদাতা) এবং নিজের কাজ সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। এ বিষয়ে কোরআন শরীফে বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলো উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমি মাত্র নমুনাস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ–

"অসংখ্য জীব এমন রয়েছে যারা কোন মওজুদ খাদ্যভাণ্ডার বয়ে বেড়ায় না, অথচ আল্লাহ–ই এদের রেজেক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রেজেকদাতা।" (সূরায়ে আনকাবুত–৬০)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا–

"পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন প্রাণী নেই, যার রেজেকদানের দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেন নি।" (সূরায়ে হূদ–৬)

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ –

"নিসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালাই রেজেকদাতা, মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।" (সূরায়ে জারিয়া –৫৮)

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ –

"আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।" (সূরা–শূরা –১২)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ – وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ – وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ –

"আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রেজেকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রেজকদাতা তোমরা নও। এমন কোন বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার হাতে নেই আর এ ভাণ্ডার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসাব অনুসারে বিভিন্ন সময় রেজেক নাজিল করে থাকি।"–(আল হিজর ২০–২১)

এসব তথ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ মানুষের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেন তা হলো এই যে, তাঁর বিরাট ভাণ্ডার থেকে রেজেক সংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা সাধনার দায়িত্ব তিনি মানুষের ওপর অর্পণ করেন। অন্য কথায় রেজেক অনুসন্ধান করা মানুষের কাজ, আর রেজেক দান করা আল্লাহ্র কাজ।

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ –

"সুতরাং আল্লাহ্র কাছে রেজেক অনুসন্ধান করো, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।" (আনকাবুত –১৭)

এরই ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের যুগে যারা খাদ্যাভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করতো কোরআন তাদের তিরস্কার করেছে।

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ –

"তোমাদের সন্তানদের অভাবের দরুন হত্যা করো না। আমিই তো তোমাদের এবং তাদের সকলেরই রেজেক দাতা।" (আল্ আনআম– ১৫১)

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ اِيَّاكُمْ -

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রেজেক দাতা।" (বনী ইসরাঈল -৩১)

এসব আয়াতে একটি ভুলের জন্যে নয়, বরং দু'টি ভুলের জন্যে তিরস্কার করা হয়েছে। প্রথম ভুল হচ্ছে নিজেদের সন্তান হত্যা করা। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই যে, সন্তানের জন্মকেই তারা দারিদ্র্যের কারণ বলে মনে করছিল। এজন্যেই দ্বিতীয় ভুলটির অপনোদনের জন্যে বলা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের খাদ্যসংস্থান করার ভার তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে বলে তোমরা কি করে বুঝে নিয়েছ? বরং আমিই তো তাদের এবং তোমাদেরও রেজেকের সংস্থান করে থাকি।

আজকাল যদিও সন্তান হত্যার পরিবর্তে অন্যবিধ উপায়ে তাদের জন্মের পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তবুও সন্তান জন্মানোর ফলে আর্থিক অনটনের আশংকাজনিত ভুল ধারণাই জন্মনিরোধের মূল কারণ হিসাবে টিকে আছে। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এটাতো হলো দুনিয়ায় অতীতে যে ধরনের চিন্তাধারার ফলে জন্মনিরোধ বা বংশ সংকোচনের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল বা বর্তমানেও হচ্ছে তৎসম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গী। এবার এ ধরনের চিন্তাকে একটি ব্যাপক আন্দোলন হিসাবে পেশ করার অনিবার্য পরিণতিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেরাই বিবেচনা করুন, ইসলাম এসব পরিণতির কোন একটিও স্বীকার করতে পারে কি না। যে জীবন বিধান ব্যভিচারকে জঘন্যতম নৈতিক অপরাধ বলে মনে করে এবং এজন্যে কঠোর সাজা দান করে থাকে, সে এমন কোন ব্যবস্থাকে কেমন করে গ্রহণ করতে পারে যার ফলে ব্যভিচার মহামারীর মত সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত আশংকা রয়েছে? যে জীবন বিধান মানব সমাজে আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় এবং ত্যাগ ও সমবেদনার গুণ সম্প্রসারণের অভিলাষী, সে জীবন বিধান জন্ম নিরোধের প্রচারের ফলে অনিবার্যরূপে যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্ট হয় তাকে কি করে গ্রহণ করতে পারে? পুনরায় যে জীবন বিধানের দৃষ্টিতে মুসলমান জাতির নিরাপত্তার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ সে কেমন করে অসংখ্য শত্রুপরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সংখ্যাকে আরো কমিয়ে তাদের রক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করার পক্ষপাতী হতে পারে?

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্যে বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না -সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই এর উত্তর অতি সহজেই দিতে পারেন। এজন্যে কোরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করার প্রয়োজন হয় না।

২নম্বর পরিশিষ্ট

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ, করাচী)

বর্তমানে প্রাচ্য দেশগুলোতে- বিশেষত, মুসিলম জাহানে জন্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে অতি দ্রুত সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্ম ও যুক্তি- উভয় দিক থেকেই এ বিষয়ে তুমুল বিতর্ক হচ্ছে এবং এ বিষয়ে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্ন দিক জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। বিতর্কের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কারো মতৈক্য হোক বা না হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিতর্কের ফলে সত্য উদ্‌ঘাটনের পথ সহজতর হয় এবং যুক্তির সংঘর্ষে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছার নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। তত্ত্বমূলক বিতর্কের দ্বারা অনুসন্ধান ও গবেষণার পথ প্রশস্ত হতে থাকে এবং মানবীয় চিন্তার ক্রমবিকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রকৃত মানুষ হচ্ছে তারা, যারা অন্ধ অনুকরণের ছক্‌কাটা রাস্তা ধরে চলার পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে সততা ও নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা-যত্নের মাধ্যমে নিজের পথ নিজেই তৈরী করে নেয়। এ ধরনের মানুষ যুক্তির ভাষায় কথা বলে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম জাহানে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হয়েছে-যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তার আজাদীকে পশ্চিমের দাসত্বের বেদীমূলে কোরবানী করে দিয়েছে। এ শ্রেণীর লোকেরা ইজতিহাদ (গবেষণা)-এর পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের পথ ধরে চলে এবং নিজেদের চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করার পরিবর্তে চোখ বুঝে দৈনন্দিন সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য পদ্দতিই গ্রহণ করতে চায়।

কোন বিষয়ের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব, চোখ বুজে কারো অনুসরণ এবং নির্বিচারে পরানুকরণের দোষ শুধু যে ধর্মানুসারীদের এক সীমাবদ্ধ শ্রেণীতে পাওয়া যায় তাই নয়, বরং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের মধ্যে এসব দোষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গোঁড়ামির মনোভাব প্রথমোক্ত দলের চেয়ে দ্বিতীয় দলেই সুস্পষ্ট। এ শ্রেণীর লোকেরা ইজতিহাদের স্বপক্ষে জোর প্রচার চালিয়ে থাকে কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজতিহাদের সাহায্যে কোন উপায়ে ইসলামকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করা। প্রকৃত ইজতিহাদের গন্ধও তারা পায় নি। তারা নিজেদের মস্তিষ্কের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের মস্তিষ্কে চিন্তা করে- পাশ্চাত্যের মুখ দিয়ে কথা বলে এবং চিন্তা-ভাবনার বালাই থেকে মুক্ত হয়ে তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। পাশ্চাত্যের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই, সেখানে ভাল ও মন্দ উভয়ই আছে। আমাদের চোখ খুলে সব কিছু দেখা দরকার এবং নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ব্যবহার করে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহকারে সব কিছু যাচাই করে

নিজেদের পথ নিজেদেরই তৈরী করে নেয়া উচিত। অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ জাতির বুদ্ধিবৃত্তির মৃত্যু ও সাংস্কৃতিক পথভ্রষ্টতা ডেকে আনে।

মরহুম কবি ইকবাল সারা জীবন এ মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন। এ শ্রেণীর লোকদের লক্ষ্য করে তিনি অভিযোগ করেছেনঃ

"পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তুমি হয়ে গেলে রাজী,
আমার অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে,
পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে নয়।"

তিনি দুঃখ করে বলেছেনঃ

"এ যুগের যে ইমাম হতে পারতো।
সে যুগান্তকারী মস্তিষ্ক আজ করছে দাসত্ব!"

আর নিজের জাতির প্রতি আল্লামা ইকবাল মরহুমের বাণী ছিলোঃ

"তুমি নিজের চোখে তাকাও যদি যুগের প্রতি,
মহাশূন্য আলোকিত করবে তোমার ঊষার জ্যোতি।
তোমার স্ফুলিঙ্গ থেকে সূর্য করবে আলো আহরণ,
চাঁদের মুখাবয়ব থেকে তোমার সৌভাগ্যের হবে স্ফুরণ।
তোমার চিন্তার মুক্তামালায় সাগর তরঙ্গায়িত হবে,
আর প্রকৃতি তোমার অলৌকিক নৈপুণ্যে লজ্জিত হবে।
অন্যের চিন্তার দুয়ারে তোমার এ ভিক্ষাবৃত্তি!
তুমি কি হারিয়েছ তোমার খুদীর সীমান্তে পৌছার শক্তি?"

দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম জাহানেও বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এ অন্ধ অনুসরণের মনোভাব নিয়েই বিচার বিশ্লেষণ চলছে। পাশ্চাত্যের রঙ্গীন চশমায় দেখার পরিবর্তে দুনিয়াকে তার নিজস্ব রঙে দেখা এবং স্বাধীন চিন্তা ও উদার দৃষ্টির পরিচয় দান করাই আমাদের উচিত। যুক্তিকে গ্রহণ করার জন্যে আমাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও পরানুকরণের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আমাদের কিছুতেই রাজী থাকা উচিত নয়। কারণ "যে যুক্তি শুনতে ও যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে নারাজ সে পক্ষপাতদুষ্ট ও হঠকারী। আর যে যুক্তি দিয়ে যুক্তির মোকাবিলায় যুক্তি পেশ করতে অক্ষম সে স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্বোধ।" এ বিষয়ে মুসলমান জাতি দাসসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করে আজাদ মনোভাব নিয়ে চিন্তা গবেষণা করবে– এইটি আমার আন্তরিক কামনা। আমি বর্তমানে যা পেশ করতে চাই তা এ প্রসঙ্গেরই সামান্যতম প্রচেষ্টামাত্র।

১। জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল কারণ কি অর্থনৈতিক

জনসংখ্যা সীমিতকরণ মতবাদে বিশ্বাসিগণ আজকাল তাদের যুক্তির ভিত্তি অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরেই স্থাপন করে এবং বাড়তি জনসংখ্যার ফলে উদ্ভূত

অসুবিধাগুলো দুর করার জন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যই কি নিছক অর্থনৈতিক কারণে বর্তমান দুনিয়ার এ আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে? ইতিহাস থেকে তো জানা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণ ও জনসংখ্যা সীমিতকরণ আন্দোলনের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ম্যালথ্যাস (Malthus) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে অর্থনীতির ভিত্তিতেই পেশ করেছিলেন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন (প্রকাশ থাকে যে, ম্যালথ্যাস জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তো বংশ সীমিত করার জন্যে স্বামী–স্ত্রীর পৃথক অবস্থান ও দাম্পত্য জীবনে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল মাত্র)। কিন্তু ম্যালথ্যাসের জামানায় ও তাঁর পরবর্তীকালে অর্থনীতি ও শিল্পক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার গতি এমন এক পথ ধরে চলতে শুরু করে যা ম্যালথ্যাসের কল্পনায়ও স্থান পায় নি অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের সীমাহীন সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

ঈসায়ী ১৭৯৮ সালে ম্যালথ্যাস অর্থনৈতিক উপকরণের অভাবের ধুয়া তুলেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তার ফলে ম্যালথ্যাস বর্ণিত সকল আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

এর পূর্ণ এক শ বছর পরে ১৮৯৮ ঈসায়ী সালে বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার উইলিয়াম ক্রোকস্ পুনরায় বিপদসংকেত দান করেন এবং বলেন যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কবলে পড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু ১৯৩১ সালের দুনিয়া উৎপাদনের অভাবজনিত সমস্যার পরিবর্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনের (Over Production) সমস্যার সম্মুখীন হয়।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উপরকণ সম্পর্কে এ যাবৎ যত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা থেকে শুধু একটি কথাই দৃঢ়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। প্রফেসার জাইড্ ও রিস্ট (Charles Gide and Charles Rist) তো নিম্নরূপ উক্তি করেনঃ

"এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তিনি (অর্থাৎ ম্যালথ্যাস) যেসব আশংকার কথা প্রকাশ করেছিলেন, বিশ্বের ইতিহাস তা সমর্থন করে না। দুনিয়ার কোন দেশই এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়নি যার দরুন সে দেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা (over prpulation) সমস্যায় পতিত বলে মনে করা যেতে পারে। কোন কোন অবস্থায় তো – দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের কথা বলা যেতে পারে – জনসংখ্যা অত্যন্ত ধীরগতিতে বাড়তে থাকে। অন্যান্য দেশে অবশ্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কিন্তু কোন দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্পদ বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী হয়নি।[৯৫]

এরিক্ রোল (Erich Roll)-ও এ কথা বলেনঃ

"অর্থনৈতিক উন্নতির বাস্তব অবস্থা ম্যালথ্যাসের পেশকৃত মতবাদকে উত্তমরূপে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করবে।"[৯৬]

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস পাঠে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, পাশ্চাত্যের কোন একটি দেশেও অর্থনৈতিক উপকরণাদির অভাব এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দৈনন্দিন প্রয়োজন পুরণের অক্ষমতা হেতু জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয় নি। যে যুগে (উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর) ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সে যুগে এ দু'মহাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিলো। যাঁরা অর্থনৈতিক কারণে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে দাবী করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতারই প্রমাণ দান করেন। নিম্নবর্ণিত সংখ্যাতত্ত্ব এ আন্দোলনের গোড়ায় অর্থনৈতিক কারণ থাকা সম্পর্কিত কাহিনীটিকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়।

দেশ	সময়	মাথাপিছু জাতীয় সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির হার
ইংলন্ড–	১৮৬০–১৯৩৮	+ ২৩১%
আমেরিকা–	১৮৬৯–১৯৩৮	+ ৩৮১%
ফ্রান্স–	১৮৫০–১৯৩৮	+ ১৩৫%
সুইডেন–	১৮৬১–১৯৩৮	+ ৬৬১%

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদ ব্যবহারকারী দের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও সম্পদ উপরিউক্ত হারে বেড়ে যায়। এভাবে জনসংখ্যা বদ্ধিকে গণনায় শামিল করে এসব দেশের বার্ষিক উন্নতির হার হিসাব করলে অবস্থা নিম্নরূপ দেখা যায়–

দেশ	উৎপাদন হারের বার্ষিক বৃদ্ধি
ইংলন্ড–	+ ২.৯%
আমেরিকা–	+ ৪.৮%
সুইডেন–	+ ৮.৫%
ফ্রান্স–	+ ১.৪% [৯৭]

৯৫. Gide and Rist: A History of Economic Doctrines, London, 1950. p.145.

৯৬. Erich Roll; A History of Economic Thought, Newyork, 1947. p.21'.

৯৭. এ সব সংখ্যাতত্ত্ব নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীতঃ
Buchanan and Ellis. Approaches to Economic Development, New York,1955.pp 213-15.

এসব তথ্য থেকে জানা গেলো যে, ইউরোপে যে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয় সে যুগে সেখানকার জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিলো এবং ক্রমে অধিকতর উন্নতির দিকে ধাবমান ছিলো। এ ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের হাড়ও প্রতি বছর দ্রুতগতিতে বাড়ছিলো। অন্য কথায় সে যুগে কোন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা ছিলো না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল না। বর্তমান দুনিয়ার অবস্থাও ঐ একইরূপ। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন গড়ে শতকরা ২.৭ হারে প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। আর এ বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের দ্বিগুণ। এছাড়া ঐ একই সময়ে শিল্প উৎপাদনের হার প্রতি বছর শতকরা ৫ হারে বেড়ে চলেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির এ হার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের প্রায় তিন গুণ।[৯৮]

এ আন্দোলনের যদি কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকে তাহলে এর প্রসারের মূলীভূত কারণ কি? আমাদের মতে ইউরোপের সামাজিক ও তমদ্দুনিক অবস্থাই এর আসল কারণ। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে নর-নারীর সমানাধিকার ও অবাধ মেলামেশার ভিত্তিতে যে সমাজ কায়েম হয়েছিলো তারই স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত পরিণতি হিসাবেই জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, যাতে করে মানুষ নিজের ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করার পরও এর স্বাভাবিক পরিণতির দায়িত্ব বহন করা থেকে রেহাই পেতে পারে। আল্লামা ইকবাল এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

کیا یہی ہے معاشرت کاکمال ؟

مرد بیکار وزن تہی اغوش !

'এই কি সমাজের বাহাদুরী
পুরুষ কর্মহীন, শূন্যকোল নারী?

পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি আগাগোড়াই সামাজিক ও তমদ্দুনিক কারণে উঠানো হয়েছে এবং অর্থনীতির সঙ্গে যদি এর কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা ' সৃষ্টধর্মী নয়' । বরং প্রলয় ধর্মী। কেননা নারীর "কোল শূন্য" ও পুরুষের কর্মহীন (unemployd) থাকার মধ্যে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। লর্ড কেনীস্, প্রফেসার হেইনসন ও প্রফেসার কোল-এর ন্যায় বিশেষজ্ঞগণও আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোকপাত করেছেন।

৯৮. A Zimmerman- এর প্রবন্ধ 'Over-Population' শিকাগো থেকে প্রকাশিত What's New পত্রিকায় ১৯৫৯ সালের বসন্তকালীন ২১১ সংখ্যা।

২। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বিশ্ব রাজনীতি

আগেই বলেছি যে, অতীতেও জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অর্থনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না–আজও নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সামাজিক ও তমদ্দুনিক কারণে এ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে এবং বর্তমানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই পাশ্চাত্য দেশগুলো অন্যান্য দেশকে এ পথ দেখাচ্ছে।

ইতিহাস পাঠকমাত্রই এ কথা জানেন যে, জনসংখ্যার রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সভ্যতা ও প্রতিটি বিশ্ব–শক্তি নিজেদের গঠন উন্নয়নের যুগে তাদের জনসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট (Will Durant) জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। আর্নল্ড টয়েনবীও (Arnold Toynbee) জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সে সব বুনিয়াদি চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলোর জোরে একটি জাতির উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটে। যে সব জাতি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং দুনিয়ার বুকে তাদের কীর্তি রেখে গিয়েছে তারা সর্বদাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প ধরে অগ্রসর হয়েছে। অপরদিকে পতনশীল সভ্যতা সকল যুগেই জনসংখ্যার অভাবের সম্মুখীন হয়েছে। জনসংখ্যা ক্রমে হ্রাস হয়ে রাজনৈতিক ও সামষ্টিক শক্তির ভিত্তি দুর্বল করে দেয় এবং যে জাতি এ অবস্থায় পতিত হয় সে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়। সভ্যতার সকল প্রাচীন কেন্দ্রগুলোর ইতিহাস এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করে।

আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের রহস্যও জনসংখ্যার মধ্যেই নিহিত। প্রফেসার আর্গানস্কীর (Albrano F. k. Organski) ভাষায়ঃ

> "জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি–এমন বৃদ্ধি যা অবাধ ও অপরিকল্পিত উপায়ে হচ্ছিল তা – ইউরোপকে দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই বিস্ফোরণের (Population Explosion) ফলেই নূতন শিল্পকারখানাভিত্তিক অর্থনীতিকে কার্যকরী করার জন্যে প্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক কর্মী পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার অর্ধেক এলাকা ব্যাপী ও বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার উপযোগী সৈনিক ও কর্মচারী তৈরী হয়ে যায়।" ৯৯

প্রফেসার আর্গনস্কীর অভিমত হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যা বেশী তাদের অবস্থা সর্বদাই উত্তম ছিলো ও রয়েছে এবং যে যুগে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিলো ঐ যুগেই তাদের অবস্থা সবচাইতে ভালো ছিলো। প্রফেসার কলিন ক্লার্ক বলেনঃ

"বৃটেনের অধিবাসীরা পরম সাহসিকতার সঙ্গে ম্যালথ্যাসের যুক্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করেছে। যদি তারা ম্যালথ্যাসের মতবাদের নিকট নতি স্বীকার করতো তাহলে বৃটেন আজ আঠারো শতকের একটি কৃষিজীবী জাতিতে পরিণত হতো। আমেরিকা ও বৃটিশ কমনওয়েলথের বিকাশ ও উন্নতির কোন প্রশ্নই ঐ অবস্থায় উঠতো না। ভারী শিল্পের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক দাবীই হচ্ছে– ব্যাপক চাহিদা পণ্য বিক্রয়ের বাজার ও পরিবহণের উন্নত ব্যবস্থা। আর এসবই একটি দ্রুত বর্ধিত জনসমাজেই সম্ভব।"[১০০]

জনসংখ্যার এই যে গুরুত্ব এর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকও রয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি জুরুরী কথা পেশ করা দরকার মনে করছি।

বর্তমানে দুনিয়ার জনসংখ্যা যেভাবে বিভক্ত হয়েছে এসব এলাকার মুসলিম জাহান বিপুল জনসংখ্যার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এসব এলাকার তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলোর জনসংখ্যা কম এবং বর্তমান গতিধারা থেকে বোঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলের লোকসংখ্যার অনুপাত আরও কমে যাবে। বিগত পাঁচ শত বছর যাবৎ জনসংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দেশগুলো বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন প্রাচ্যদেশগুলোর উপর তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য কায়েম করতে পেরেছিলো, বরং সাম্রাজ্যবাদিতার প্রাথমিক যুগেই এ ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয় যে, জনসংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জাতিগুলো স্থায়ীভাবে তাদের প্রাধান্য কায়েম রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু নূতন অবস্থা ও বাস্তব তথ্যাবলী এ অমূলক ধারণার জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জনসংখ্যা ক্রমেই কমে যাওয়ার ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবনতি ঘটেছে এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে সেখানকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, জনসংখ্যা সীমিতকরণ প্রচেষ্টর মূল্য খুব বেশী পরিমাণে দিতে হচ্ছে। ফ্রান্সও ধীরে ধীরে বিশ্বের দরবারে তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্শাল প্যাঁতে এ কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছেন যে, ফ্রান্সের অবনতির সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে সন্তান সংখ্যার স্বল্পতা (Too Few children) ও লোক সংখ্যার অভাব। ইংলন্ড ও অন্যান্য দেশেও জন্মনিরোধের কুফল ফলতে শুরু করেছে এবং এ অবস্থা দেখে সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলন্ড ইটালী প্রভৃতি দেশসমূহ তাদের কর্মনীতি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে দিয়েছে।

---

৯৯. Organaski Albrano F.k. Population and Politics in Europe," Science Magazine, American Association for the Advancement of Science, vide Loory Stuart H, Population Explosion, Dawn' July 17,1961.

১০০. Colin Clark, "World Population and Food Supply", Nature vol, 181,May, 1958.

এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, ওপরে বর্ণিত দেশগুলোতে জনসংখ্যা কমানোর পরিবর্তে বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জাতিগুলো তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বহাল এবং বিশ্বরাজনীতির রাজমুকুট মস্তকে দীর্ঘাকাল রাখার জন্যে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বাড়ানো দরকার সে পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হবে কি না–এ বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বাড়িয়েও ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে প্রাচ্য দেশ ও মুসলিম জাহানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

পুনরায় যে সূক্ষ্ম শিল্প, বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্যাবলী এ পর্যন্ত প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের প্রাধান্য কায়েম করে রেখেছিলো এবং বহু চেষ্টা করে প্রাচ্যকে এ বিষয়ে অজ্ঞ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিলো বর্তমানে সে সব তথ্য ও জ্ঞানের ব্যাপারেও প্রাচ্য দেশগুলো দ্রুত উন্নতির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এসব দেশের জনসংখ্যা পাশ্চাত্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী– সেহেতু আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হবার পর এদের পরাধীন থাকার আর কোন কারণই থাকতে পারে না। ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী উক্তরূপ বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রাধান্যের দিন সীমিত হয়ে যাবে এবং যে সব দেশ জনসংখ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরী ও যুদ্ধবিদ্যায় অগ্রসর তারাই বিশ্বরাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলো এক ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক খেলা শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ একদিকে বংশ সীমিতকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাচ্য দেশসমূহের লোক সংখ্যা কমানোর এবং অপরদিকে কারিগরী তথ্যাবলীর প্রসারে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রাধান্য বহাল রাখার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। আমি নিছক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এ কথা বলছি না, বরং পাশ্চাত্য দেশের উপকরণাদি থেকেই আমি এটা প্রমাণ করতে পারি। জনসংখ্যা সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। সে সবের মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত করে ভীতি হিসাবে পেশ করা হয়েছে এবং এসব দেশে জন্মনিরোধ প্রবর্তনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এসব পুস্তক পাশ্চাত্য দেশীয়দের মন–মগজ ও সরকারগুলোকে প্রভাবিত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বাস্তব কার্যধারা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আমার দাবির সমর্থনে কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি। বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা, "ফরেন এফেয়ারস" (Foreign Affairs)–এ ফ্রাঙ্ক নোটেনস্টন "Politics and Power in Post-war Europe" (যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রাজনীতি ও ক্ষমতা) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"উত্তর পশ্চিম ও ইউরোপের কোন জাতির পক্ষে দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। জার্মানী এককালে দুনিয়াতে শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলো, কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির মত আজ জার্মানীও সেদিন হারিয়ে ফেলেছে। আর এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে সব দেশের জনসংখ্যা

আজ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে সে সব দেশেই শিল্প ও কারিগরী সভ্যতা প্রসার লাভ করছে।"১০১

এশিয়া ও মুসলিম জাহানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুন ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিংশ শতকের শেষার্ধেই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার তীব্র আশংকা রয়েছে। টাইম (Time) নামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক পত্রিকার ১১ই জানুয়ারী ১৯৬০ সংখ্যায় লেখা হয়েছেঃ

"জনসংখ্যার আধিক্য (Over Population) সংক্রান্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের যাবতীয় ভীতি এবং এজন্যে তাদের সমস্ত প্রচারণা ও উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিসমূহ বর্তমান হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে বিপুল সংখাধিক্য সৃষ্টি করলে যে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হবার আশংকা আছে তারই ফল বিশেষ।" ১০২

আর্নল্ড গ্রীন (Arnold H. Green) লিখেছেনঃ

"বিগত ৫০ বছরে দুনিয়ার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং এজন্যে সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যের (Balance of Economic and Military Power) ওপর ভীষণ চাপ (Strain) পড়েছে।"১০৩

আর্থার ম্যাক্‌করম্যাক (Arther Mccormack) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেনঃ

"উন্নত দেশের অধিবাসিগণ স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা কমিয়ে রাখা পছন্দ করে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উন্নত দেশের অধিবাসিগণ তাদের নিজেদের জীবন যাত্রার মান এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা (Security) বিপন্ন মনে করে।" ১০৪

ম্যাক্‌করম্যাক পাশ্চাতের এ ঘৃণ্য মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, প্রাচ্যের অধিবাসিগণ শীঘ্রই এ হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হবে এবং তারপর তারা পাশ্চাত্য জাতিদের কিছুতেই মাফ করবে না। কারণঃ

"এটা সাম্রাজ্যবাদের একটি নতুন ধরন। এর লক্ষ্য হচ্ছে অনুন্নত জাতিগুলোকে, বিশেষত সাদা রংয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যে কালো আদমীদের পদদলিত করে রাখা।" ১০৫

---

১০২. Time Magazine, 11 January, 1960.

১০৩. Green Arnold, H. Sociology: An Analysis of Life in Modern Society, New York, 1960 p. 154.

১০৪. Mccormack, Arther, People, Space, Food, London 1960. Page 77.

১০৫. Mccormack, Arther, People, Space, Food, London 1960. Page 78.

আমি পাশ্চাত্য লেখকদের অসংখ্য উদ্ধৃতি পেশ করতে পারি। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের জন্যে এ কয়টি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করি।

উপরিউক্ত সমগ্র আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা গেলো যে, ভবিষ্যতে যে সব দেশের জনসংখ্যা বেশী হবে এবং নয়া কারিগরী বিদ্যাও যাদের আয়ত্তে থাকবে তারাই শক্তিশালী দেশ হিসাবে প্রাধান্য লাভ করবে। এখন এসব দেশকে আধুনিক কারিগরী বিদ্যা থেকে কোনক্রমেই দূরে রাখা যাবে না। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য জতিসমূহের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বহাল রাখার একটি মাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা সীমিতকরণ। এ কারণেই পাশ্চাত্য দেশগুলো নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং এই সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলোতে তাদের প্রচারণার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করে জন্মনিরোধের সপক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে।[১০৬] আর অনেক সরল প্রাণ মুসলমান এগিয়ে গিয়ে এ প্রতারণার জালে ধরা দিচ্ছে।

مکر کی چالوں سے بازی لے گیاسر مایہ دار

انتہائے سادگی سے ھر گیا مزدور ماتِ

"চক্রান্তের চালবাজীতে জয়ী হলো পুঁজিপতি
আর সরলতার আধিক্যে হেরে গেলো মেহনতি।" (ইকবাল)

কিন্তু এখন গোমর ফাঁক হয়ে গেছে, যদি এর পরও আমরা পুনরায় প্রতারিত হই তাহলে এর কুফলের জন্যে আমরা নিজেরাই দায়ী হবো এবং আজ যে 'দরদিগণ' আমাদের জন্মনিরোধের সবক দিচ্ছে, কাল তারাই জনশক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করার চেষ্টা করবে। আল্লামা ইকবাল এ বিপদের আভাস আগেই পেয়েছিলেন। তাই মুসলিম জাতিকে এ বিষয়ে হুশিয়ার থাকার জন্যে তাগিদ করেছিলেন। তাঁর কথাগুলো আজও আমাদের চিন্তা ও কাজে পথ নির্দেশ করে। তিনি বলেনঃ

"সাধারণত বর্তমানে ভারতে (পাক-ভারত-বাংলাদেশে) যা কিছু হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে তার সবটুকুই ইউরোপীয় প্রচারণার ফলমাত্র। এ জাতীয় বই-পুস্তক সয়লাবের গতিতে আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ব্যবস্থার প্রসার ও স্থায়িত্ব দানের জন্যে অন্যান্য উপায় পন্থাও ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ এরা নিজেদের দেশে জনসংখ্যা কমানোর পরিবর্তে বাড়ানোর চেষ্টা করছে। আমার মতে এর

---

১০৬. এ ব্যাপারে অপর একটি চিত্তাকর্ষক দিক এই যে, পাশ্চাত্য জাতিগুলো এদের যাবতীয় প্রচারণা বন্ধু রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছে। এদের বিরোধী চীন ও রাশিয়া এ প্রচারণার প্রভাবে পড়ে নি। অন্য কথায় পাশ্চাত্য জাতিগুলো এ প্রচারণার দ্বারা বন্ধুদেরই সংখ্যা কমাচ্ছে-দুশমনের সংখ্যা কমানো তাদের আয়ত্তের বাইরে।- (আবুল আলা মওদুদী)

কারন হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোর নিজেদের কার্য–কলাপের ফলে তাদের জনসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং অপরদিকে প্রাচ্য দেশে জনসংখ্যা ক্রমেই ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই প্রাচ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ইউরোপ তাদের জন্যে ভয়াবহ বিপদ বিবেচনা করছে।"[১০৭]

এটা হলো এ বিষয়ের মূল কথা ও আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিকা। এ আন্দোলনের পটভূমিকা ভালভাবে জেনে না নিলে আমরা এ সম্পর্কিত প্রকৃত ব্যাপার বুঝতেও পারবো না এবং কোন সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

৩। জনসংখ্যা ও দেশরক্ষা

দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। অধ্যাপক অর্গানস্কী যথার্থই বলেছেন, "যে ব্লকের লোকসংখ্যা বেশী হবে, সেই ব্লকই অধিকতর শক্তিশালী হবে।" যারা সামরিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তারা ভালভাবেই অবগত আছেন যে, আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে দেশরক্ষার ব্যাপারে অধিক লোকসংখ্যার গুরুত্ব পূর্বের চেয়েও অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে। কিছু কল পূর্বে ধারণা হচ্ছিল, নয়া যুদ্ধাস্ত্রের কারণে দেশরক্ষা বিষয়ে জনসংখ্যার গুরুত্ব কমে যাচ্ছে এবং জনশক্তি ক্রমেই যুদ্ধে প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ আর এ ধারণায় বিশ্বাসী নয়। কোরিয়া যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জনসংখ্যার আধিক্যের কারণেই চীন আমেরিকার উৎকৃষ্ট ধরনের যাবতীয় হাতিয়ার ব্যর্থ করে দেয়। আমেরিকার নয়া সামরিক বাহিনীতে স্থল–সৈন্য ও গেরিলা সৈন্যদের আগাগোড়া নূতন ছাঁচে ঢেলে গঠন করা হচ্ছে। এজন্যেই দেশরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেও জনসংখ্যা সম্পর্কে চিন্তা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিছক দেশরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের অবস্থা বত্রিশ দাঁতের মধ্যে একটি জিহ্বারই মত। আমাদের একদিকে ভারত রাষ্ট্র রয়েছে। এদেশের জন সংখ্যা আমাদের দেশের জনসংখ্যার পাঁচ গুণ এবং আমাদের দেশের সংগে সে দেশের সম্পর্কও নানা কারণে অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে অবস্থান করছে; অন্যদিকে রাশিয়ার মত বিশাল দেশ। এদেশ সারা বিশ্বে কমিউনিজম প্রসারের জন্যে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করে আসছে এবং সে দেশের জনসংখ্যাও আমাদের দেশের জনসংখ্যার তিন গুণ।

---

১০৭. দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'হাঁমদর্দে ছেহেত' নামক পত্রিকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংখ্যা জুলাই, ১৯৩৯, ১৮২ পৃষ্ঠা–লাহোর থেকে প্রকাশিত 'আল হাকিম' পত্রিকায় ১৯৩৬ সালের নভেম্বর সংখ্যায় আল্লামা ইকবাল এ তথ্য প্রকাশ করেন।

অপর দিকে চীন রয়েছে। এশিয়া মহাদেশে ক্রমেই চীনের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এদেশে আমাদের দেশের আট গুণ অধিবাসী রয়েছে। এ তিনটি দেশেরই নজর রয়েছে আমাদের প্রতি–আর যে নজরে তারা আমাদের দেখছে তাকে কোনমতেই সুনজর মনে করা যায় না। এমতাবস্থায় আমাদের দেশরক্ষার প্রকৃত চাহিদা উপলব্ধি করা উচিত। জনসংখ্যা কমিয়ে আমাদেরকে আরো দুর্বল করা উচিত অথবা লোক সংখ্যা বাড়িয়ে দেশকে এতটা শক্তিশালী করা দরকার যেন কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও না পায়।

এভাবেই সমগ্র মুসলিম জাহানের দিকে তাকালে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, আমরা তিনটি বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন।

প্রথমত, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। এ সংগ্রাম বর্তমানের একটি নয়া পর্যায়ে উপনীত হয়েছে মাত্র। সুয়েজ ও বিজার্তায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দুনিয়ায় দুর্বলের কোনই মর্যাদা নেই এবং মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো এখনো নিরাপদ নয়। যদি আমরা উন্নত শিরে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির মান অত্যন্ত উন্নত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সবচাইতে বড় সমস্যা হলো ইস্রায়ীলী সাম্রাজ্যবাদ। ইস্রায়ীল রাষ্ট্র অধিক সংখ্যক সন্তান জন্ম দিয়ে এবং বহির্বিশ্ব থেকে লোক আমদানী করে জনসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টায় তৎপর। সমগ্র দুনিয়ার ইহুদীদের সম্পদ এ রাষ্ট্রের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে; আর এ রাষ্ট্র সামরিক ও যুদ্ধাস্ত্রের শক্তি প্রতি মুহূর্তেই বাড়িয়ে চলেছে। এ রাষ্ট্রের বর্ধিষ্ণু শক্তির সম্মুখীন হবার জন্যেও দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন স্থানে মুসলিম জাহানের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টায় রত। ইরান, পাকিস্তান, ইরাক ও তুরস্কের সীমান্তে বিশেষভাবে এরা চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি এদের সম্পর্কে সামান্য মাত্র উদাসীন হই, তাহলে আল্লাহ্ না করুন, আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

এসব অবস্থায় আমাদের জন্যে দেশরক্ষায় জনসংখ্যার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায় এবং মুসলিম জাহানের পক্ষে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যা আমাদের জাতীয় আত্মহত্যার শামিল হয়।

পুনঃ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মনে রাখা দরকার যে, পূর্বদিকে পাশ্চাত্য দেশ ও কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে মুসলিম জাহান দুর্লংঘ প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

সমগ্র কম্যুনিস্ট ব্লক তাদের জনসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টায় তৎপর রয়েছে। রাশিয়া ও চীন বিশেষভাবে জনসংখ্যা বাড়ানোর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে এবং তারা দাবি করেছে যে, তাদের বর্তমান জনসংখ্যার কয়েক গুণ বেশি পরিমাণ জনসংখ্যাকে তারা অতি সহজেই কর্মে নিযুক্ত করতে পারবে। শুধু তা-ই নয়, এ-ও তাদের দাবী যে, দুনিয়ার সকল দেশই জন্মনিরোধ না করে কম্যুনিস্ট ব্যবস্থাধীনে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। তাদের মতে জনসংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় শুধু পুঁজিবাদী দেশে।

অনুরূপভাবে ইউরোপের দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ইউরোপের কম্যুনিস্ট ব্লকের (রাশিয়াসহ) অধিবাসী সংখ্যা ৩০ কোটি ২০লক্ষ। দুনিয়ার জনসংখ্যা হিসাব করে জানা যায় যে, কম্যুনিস্ট ব্লকের অধিবাসী সংখ্যা প্রায় এক অর্বুদ আর অবশিষ্ট দুনিয়ার (নিরপেক্ষ দেশগুলোসহ) অধিবাসী সংখ্যা দুই অর্বুদ মাত্র। এ অনুপাত অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি কম্যুনিস্ট ব্লকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অকম্যুনিস্ট দেশে জনসংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা জারী থাকে তাহলে যে শীঘ্রই উল্লিখিত সংখ্যানুপাত পালটিয়ে যাবে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোর দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে এটা উপলব্ধি করার জন্যে অস্বাভাবিক ধরনের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজদন হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলোর পক্ষেও আপাতস্বার্থের দৃষ্টিতে কাজ করা উচিত নয়, বরং দূরদর্শিতা সহকারে তাদের সমগ্র কার্যসূচী সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

৪। কতিপয় অর্থনৈতিক তথ্য

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়, তবু কতিপয় দিক এমনও আছে যেগুলোর সম্পর্কে অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম সাধারণত অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে উপকারই প্রমাণিত হয়। দুনিয়াতে যত মানুষ আসে তারা শুধু একটি পেট নিয়েই আসে না, বরং তাদের সকলেই দুটি হাত, দুটি পা এবং একটি মস্তিষ্কও নিয়ে আসে। পেট যদি অভাব পুরণের দাবী পেশ করে তাহলে অপর পাঁচটি অঙ্গ তা পূরণ করতে চেষ্টা করে। এছাড়া অর্থনীতিবিদদের একটি বিরাট প্রভাবশালী দল এ অভিমতের সমর্থক যে, অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় অধিক সংখ্যক শিশুর জন্ম অত্যন্ত উপকারী। কারণ এর ফলে একদিকে প্রয়োজনীয় শ্রম (Labour) ও অন্যদিকে উৎপন্ন দ্যব্যাদির ফলোৎপাদক চাহিদা (Effective Demand) সৃষ্টি হয়। তাঁরা এ সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, একটি উন্নত দেশের অর্থনৈতিক মান কায়েম রাখার ও চাহিদা সম্প্রসারণের (যেন বাজারে মন্দাভাব দেখা দিতে না পারে) জন্যে জনসংখ্যাকে ক্রমেই বাড়ানো উচিত। লর্ড কেনিজ (I. M. Keynes). অধ্যাপক হান্‌সান (A. I. Hanson), ডক্টর কলীন

ক্লার্ক (Colin Clark), অধ্যাপক জি. ডি. এইচ. কোল (G. D. H. Cole) এবং আরও অন্য অনেক চিন্তাবিদ এ ধরনেরই মত প্রকাশ করেছেন। আর অর্থনীতির ইতিহাসও এ অভিমতের সমর্থনই করে থাকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, সমগ্র দুনিয়ায় যে সব উপকরণ মওজুদ আছে তা শুধু যে বর্তমান জনসংখ্যাকে প্রতিপালনের জন্যে যথেষ্ট, তাই নয় বরং জনসংখ্যার যে কোন সম্ভাব্য বাড়তি পরিমাণকেও প্রতিপালন করার জন্যে যথেষ্ট। কোথাও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণ উপকরণ রয়েছে এবং কোথাও বা এসব মোটেই ব্যবহার করা হচ্ছে না। কলীন ক্লার্ক অত্যন্ত বলিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে বলেন যে, দুনিয়ার মানুষের জ্ঞানের আওতায় যে সব উপকরণ রয়েছে শুধু সেগুলোকেই সঠিকরূপে ব্যবহার করে দুনিয়ার বর্তমান জনসংখ্যার দশ গুণ অধিবাসীকে স্বচ্ছন্দে ইউরোপীয় মানের খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।[১০৮]

জে. ডি. বার্ণালও (J. D. Bernal) নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর এ অভিমতই প্রকাশ করেন।[১০৯]

তৃতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় বর্তমান জনসংখ্যা সম্পর্কে যে সব হিসাব প্রকাশ করা হয় তা যদি গ্রহণযোগ্য বলে ধরেও নেয়া যায়, তবু অতীত ও ভবিষ্যতের গতিধারা সম্পর্কে অনুমানভিত্তিক যা কিছু বলা হয় সে সম্পর্কে অনেক মতভেদের অবকাশ রয়েছে। কারণ ডেমোগ্রাফী (Demography) জাতীয় বিদ্যা সবেমাত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। তাই এ বিদ্যা এখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে নি যার ওপর ভরসা ও নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সঠিক অনুমান করা যেতে পারে। খুব বেশি পরিমাণ নির্ভর করেও আমরা এ বিদ্যার ভিত্তিতে শুধু নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই কিছু অনুমান করতে পারি–শত শত বছর পরে জনসংখ্যার গতি ও প্রকৃতি কি ধরনের হবে তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্বাসযোগ্য হিসাব পেশ করার মত নির্ভরযোগ্য কোন উপায় উপাদানই এ যাবৎ আমাদের হস্তগত হয় নি। উপরন্তু জনসংখ্যার গতিধারা সম্পর্কেও অনেক তথ্য এখনও আমাদের অজ্ঞাত। উদাহরণস্বরূপ ডাঃ আর্নাল্ড টয়েনবী (Dr. Arnold Toyenbee) বলেছেন যে, ২৩টি সভ্যতার মধ্যে ২১টিতেই উন্নতির শিখরে ওঠার

---

১০৮. International Labour Review, August, 1953-তে "Population Growth and Living Standards" শীর্ষক প্রবন্ধ।

১০৯. অধ্যাপক বার্নাল এ বিষয়ে 'World without war' নামক যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন এবং অনস্বীকার্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত করেছেন যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় দুনিয়ার উপকরণের পরিমাণ অনেক বেশি।

পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পুনরায় কমে যেতে দেখা গেছে। জনসংখ্যার স্বাভাবকি বৃদ্ধির ইতিহাসও এ কথা সমর্থন করে। রেমন্ড পার্ল (Raymond Pearl) এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

"শৈল্পিক উন্নতি, শহরোন্নয়ণ ও এর ফলে উদ্ভুত লোক বসতির ঘনত্ব যতই বেশী পরিমাণে হতে থাকবে ততই উর্বরতা ও জন্মহার কমে যেতে থাকবে। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্র ও সর্বদা এরূপ হতে দেখা গেছে"। [১১০]

ডাঃ মেডওয়ার এফ, আর, এস, তদীয় ১৯৫৯ সালের অধ্যাপনার বক্তৃতায় জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী সম্পর্কিত অসুবিধাগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন।[১১১]

"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক সরকারী রিপোর্টেও এ কথা বলা হয় যে, অতীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও সে হারে অগ্রসর হতে থাকবে বলে মনে করা ভুল। এ রিপোর্ট অনুসারেই-"বর্তমান সময়ের অনুমান ও হিসেবগুলোকে সুদূর ভবিষ্যতের ওপর প্রয়োগ করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা"। [১১২]

এই রিপোর্ট অনুসারে বর্তমান শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ের জন্যে সঙ্গত ভাবেই অনুমান করা যেতে পারে-এর বেশি নয়। অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতে আমরা বেশির পক্ষে মাত্র দশ বা পনর বছর সময়ের জন্যে একটা অনুমান করতে পারি এবং এর বেশি সময়ের জন্যে এরূপ করা অসতর্কতার পরিচায়ক হবে। [১১৩] অপর একজন সমাজ বিজ্ঞানী সমগ্র বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ করেনঃ

"জনসংখ্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ও ভবিস্যদ্বাণীগুলোতে লোকের আগ্রহ অত্যন্ত কমে গেছে আর এর কারণ হচ্ছে অবস্থার অভাব। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ মহলে বাইরে (non-Demographers) সাধারণত ধারণা করা হতো যে, পরিসংখ্যান এমন একটি বিদ্যা যার সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হলে তা অস্বাভাবিকরূপে সঠিক হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্য আসতে থাকে এবং অবশেষে তা আস্থাহীনতায় পরিণত হয়েছে।" [১১৪]

---

১১০. Raymend Pearl, "The Biology of Population Growth", In Natural History of Population, P. 227.

১১১. Dr. P. B. Medawarad রচিত ' The Future of Man' পুস্তক "The Falliblity of Prediction" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত লন্ডন, ১৯৬০ সাল।

১১২. The Future Growth of World Population P-21.

১১৩. Migration News, Ceneva, March April 1959, Page 2.

১১৪. Sociology To-day, Ed. R. K. Mertor, Newyork, 1956, Page 215

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার অনুমান ও এর গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সাধারণ সংবাদ পরিবেশনের মত ৬০০ বছর পর দুনিয়াতে মানুষের দাঁড়াবারও স্থান থাকবে না বলে উক্তি করাও অত্যন্ত আপত্তিকর।

চতুর্থ কথা হচ্ছে এই যে, অর্থনেতিক দৃষ্টিকোণ থেসে যদি জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, অর্থনৈতিক কাঠামোর (Structure of the Economy) সাথে এর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পাশ্চাত্য দেশের বিশেষ অবস্থা অনুসারে সেখানে বিশেষ কাঠামোতে বিরাট আকারে ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত করার নীতিতেই অর্থনীতিকে সংগঠিত করা হয়েছিলো এবং এর যাবতীয় প্রচেষ্টা ও তৎপরতার লক্ষ্য ছিলো শ্রমের জন্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ ও পুঁজির জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা নির্ধারণ। এ ধরনের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী ভারী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি (Capitalist Intensive Industry) বলা হয়। এ ধরনের অর্থনীতিতে শ্রমের প্রয়োজন দিন দিন কমে যায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু যদি অর্থনীতিকে অন্য কোনো কাঠামোতে সংগঠিত করা যায় তাহলে নূতন কাঠামোতে জনসংখ্যা একটা সমস্যারূপে দেখা দেবে না। জাপানে এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত মওজুদ আছে। জাপান বুঝতে পেরেছিলো যে, ভারী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি তাদের উপযোগী নয়। সে দেশে পুঁজি কম এবং শ্রম অনেক বেশি ছিলো। এজন্যে সে দেশ বিকেন্দ্রীকরণ নীতির অধীনে ছোট ছোট শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এ শিল্পকে উচ্চমানে উন্নীত করার চেষ্টা করে। এর ফলে তাদের শ্রমশিল্প শ্রম বিনিয়োগকারী শিল্পে পরিণত হয় এবং তাদের জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও কোন সমস্যা দেখা দেয় নি। জাপানের আয়তন পাকিস্তানের অর্ধেক মাত্র। তা-ও সে দেশের সমগ্র ভূখণ্ডের মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ চাষাবাদ যোগ্য। অবশিষ্ট জমি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের দরুন অকেজো অবস্থায় আছে। এ হিসাব অনুসারে জাপানের আবাদ যোগ্য জমি পাকিস্তানের আবাদী জমির মোট পরিমাণের বারো ভাগের এক ভাগ $\frac{১}{১২}$ মাত্র। কিন্তু জাপান আমাদের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যক অধিবাসীর জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে এবং নিজের অর্থনৈতিক শক্তিকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, তার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বৃটেন ও আমেরিকার বাজার দখল করে ফেলেছে। এমন কি ইউরোপের সকল দেশ এক জোট হয়েও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হয় নি।

শুধু তাই নয়, তার রাজনৈতিক শক্তিও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, সমগ্র পাশ্চাত্য জগতকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, নেহাত হালকাভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কে অধ্যয়ন করা উচিত নয়। যদি অর্থনৈতিক কাঠামোকে দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উন্নত ছাঁচে ঢালাই করা হয় তাহলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা কখনও কোন সমস্যারূপে দেখা দেবে না। বর্তমান দুনিয়ায় মানুষ যদি দারিদ্র্য, অভাব ও দুরবস্থায় পতিত হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে আমাদের নিজেদেরই ভুলের কারণে। প্রাকৃতিক উপায়-উপাদানকে এজন্যে দায়ী করা যায় না। এ সম্পর্কেও আমি কতিপয় জুরুরী বিষয় পেশ করতে চাইঃ

(ক) আমাদের নিকট যেসব উপকরণ রয়েছে তা আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি না। উপকরণ মওজুদ রয়েছে, এমন কি প্রাচুর্যও রয়েছে। কিন্তু মানুষ অলসতা ও কর্মবিমুখতার দরুন এগুলো থেকে উপযুক্ত পরিমাণ কল্যাণ হাসিল করতে পারছে না। এটিই পৃথিবীতে বিরাজমান দারিদ্র্যের সব চাইতে বড় কারণ।

(খ) মানুষের প্রয়োজন পূরনের উপযোগী যাবতীয় উপায়-উপকরণ প্রকৃতিই দুনিয়াতে রেখে দিয়েছে। উপকরণের দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র দুনিয়া এক অখন্ড ইউনিট। দুনিয়াতে এমন একটি দেশও নেই যেখানে তার অধিবাসীরা প্রয়োজন পূরণ করার সকল উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত করতে পারে। সমগ্র দুনিয়ার সকল উপকরণ একত্রে গোটা মানব সমাজের জন্যে যথেষ্ট। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে এ ধরনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সমগ্র দুনিয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের চিন্তা-গেবেষণা করা উচিত। দেশের মধ্যে যেমন বিভিন্ন শহরকে আমরা প্রয়োজনীয় উপকরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিতে পারি না, তেমনি সমগ্র দুনিয়া সম্পর্কেও ঐরকম মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আর এ ধরনের দৃষ্টিভংগী প্রবর্তিত হলেই দুনিয়ার উপায়-উপকরণগুলো সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারবে।

(গ) উপরিউক্ত ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগীর কারণেই অত্যন্ত ভ্রান্ত পদ্ধতিতে সম্পদের বর্তমান বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা জারী আছে। যেখানে কোন দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে সেখানেই তার অপচয় হচ্ছে। অন্যস্থানে এ দ্রব্যের অভাবে যারা কষ্ট ভোগ করছে এগুলো তাদের ব্যবহারে আনার কোন উপায় নেই। যারা বলে থাকে দুনিয়ার উৎপাদন ক্ষমতা জনসংখ্যার তুলনায় কম তারা জানে না যে, পাশ্চাত্য জগত, বিশেষত আমেরিকায় উৎপাদনের ঘাটতি নামক কোন সমস্যাই নেই, সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন (Over Production) সমস্যারূপে বিরাজমান। কি পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত

উৎপাদন হয় তা নির্ণয় করাই তাদের জন্যে একটি স্থায়ী মাথা ব্যথার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন সরকারকে প্রতি বছর ২০ কোটি থেকে ৪০ কোটি ডলার (প্রায় এক অর্বুদ টাকা) শুধু অপ্রয়োজনীয় আলু নষ্ট অথবা কম মূল্যে বিক্রয় করার জন্যে খরচ করতে হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার কোটি কোটি টাকার কিশমিশ ও মনাক্কা শূকরদের খাইয়ে দেয়া হয়।

আমেরিকার ক্রেডিট কর্পোরেশনের নিকট ২০ অর্বুদ ডলার (প্রায় ১৯০ অর্বুদ টাকা) মূল্যের দ্রব্য-সামগ্রী অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় দ্রব্যের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য
তূলা	প্রায় ৫০ লক্ষ গাট	৭৫ কোটি ডলার
আটা	৪০ কোটি ব্যাসিল[১১৫]	৯০ "
ভূট্টা	৬০ " "	৯০ " "
ডিম (শুষ্ক)	৭ কোটি পর্যন্ত	১০ " "
মাখন	১০ " "	৬ " "
দুধ (শুষ্ক)	২৫ " "	৩ " "[১১৬]

এভাবেই E. A. O. পরিবেশিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, অব্যবহৃত মওজুদ স্টকের পরিমাণ বরাবর বেড়েই চলেছে এবং কোটি কোটি মণ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যেও কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ ঐ একই সময় দুনিয়ার অন্যান্য অংশে দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব মানুষকে অস্থির করে রেখেছে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে বিরাজ করছে তখন আমরা অভাবের ধুয়া তুলে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উপকরণের বিরুদ্ধে চীৎকার করছি কোন্ কারণে?

শ্যাক্সপীয়ার বলেনঃ

The fault, dear Brutus, is not in our Stars.
But in ourselves that we are, underlings.

---

১১৫. ব্যাসিল-২৯ সের পরিমাণ ওজনে এক ব্যাসিল হয়।
১১৬. ড্যাডলে স্টাম্প প্রণীত "Our Developing World"-এর ১৬৬ পৃঃ

"আসমান ও জমীনের কোথায়ও গলদ নেই। গলদ যা আছে তা আমাদের নিজেদেরই মধ্যে। নিজের চোখের মণির প্রতিই আমাদের তাকানো উচিত।"

পাশ্চাত্য দেশীয়দের স্বার্থপরতাই দুনিয়ার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ। সভ্যতার ধ্বজাধারী হয়ে তারা একদিকে নিজেরেদ উৎপন্ন দ্রব্যাদি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বাজার দর কায়েম রাখার জন্যে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং মানব জাতিকে এসব দ্রব্যের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করছে, অন্যদিকে তাদের সকল উপায় উপাদান–উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত না করে ভোগ ও বিলাসিতায় লাগিয়ে দিচ্ছে।

অধ্যাপক লিন্ডসে বলেনঃ

"ভোগস্পৃহায় মগ্ন পাশ্চাত্য জাতি এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তারা তাদের সমগ্র শক্তি খাদ্য ও রসদ বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত করতে রাজী নয়। [১১৭]

(ঘ) প্রাচ্য দেশগুলোতে দুর্বলতা ও অলসতা নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যের উপকরণ থেকে পাশ্চাত্য যেভাবে স্বার্থোদ্ধার করছে তাও প্রাচ্যের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দূরবস্থার জন্যে বহুল পরিমাণ দায়ী। পাশ্চাত্য দেশগুলো যেভাবে প্রাচ্য দেশের সম্পদ ও উপকরণ লুণ্ঠন করছে এবং আফ্রিকার দেশসমূহে আজো লুণ্ঠন করে চলেছে তার ইতিহাস তিক্ততায় পরিপূর্ণ। আজাদী লাভের পর এসব দেশে শত উপায়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সুবিধা ভোগ করার ব্যবস্থা জারী করেছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিহীনতা (Instability)। পাশ্চাত্য দেশগুলো প্রাচ্য থেকে যে সব দ্রব্য খরিদ করে সেগুলোর মূল্যমানকে স্থিতিশীলতায় পৌঁছতে তারা দেয় না। এর ফলে প্রাচ্য দেশগুলোকে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একমাত্র কোকের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কমে যাওয়ার দরুন পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোকে মাত্র এক বছরে (১৯৫৬ সালে) ৬২ কোটি ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। (১৯৫৪ সালে কোকোর দাম ছিলো প্রতি পাউণ্ড ৭৫ সেন্ট–১৯৫৬ সালে এর দাম পাউণ্ড প্রতি মাত্র ২৬ সেন্ট হয়ে যায়) পুনঃ রবারের দামে স্থিতিহীনতার দরুন এক বছরে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার এক অর্বুদ ৩২ কোটি ডলার ক্ষতি হয়। (১৯৫১ সালে এর দাম ছিল প্রতি পাউণ্ড ৫৬ সেন্ট–১৯৫৪ সালে এর দাম দাঁড়ায় মাত্র ২৩ সেন্ট) [১১৮]

সকল তথ্য বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের যাবতীয় সমস্যা এই মহামহিম মানুষেরই সৃষ্টি। ওপরের দুটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, দ্রব্যের

---

১১৭. Landis, Social Problems, Chicago, 1959 P-600.

১১৮. ডাডলে ষ্টাম্প প্রণীত পুর্বোল্লিখিত পুস্তক ১৭২ পৃষ্ঠা

মূল্যমানে স্থিতিশীলতা কায়েম হলে এবং এদেশগুলোর অসহায়ত্বের সুযোগে পাশ্চাত্য দেশগুলো অযৌক্তিক সুবিধা আদায়ের ফন্দি না করলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পূর্ণ সম্পদ জাতির উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত হতে পারতো। অনুন্নত দেশগুলোর সম্পদের অভাব আছে–সন্দেহ নেই। আর এ অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এও সত্য। কিন্তু অভাবের মূল কারণ কী? যে সব দয়ালু জাতি অনুন্নত দেশগুলোর অভাব সম্পর্কে রাত দিন নানা সুরের ঝংকার তোলে আর প্রাচ্যবাসীদের প্রতি সন্তান না জন্মানোর নসিহত খয়রাত করে, এ অভাব তাদেরই সৃষ্টি।

(ঙ) এ ধরনেরই অপর একটি বিষয় হচ্ছে সমর সরঞ্জাম। দুনিয়ায় যে পরিমাণ সম্পদ সমর সরঞ্জাম তৈরীর কাজে লাগানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ তসংগত। এর বৃহত্তম অংশ উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত হলে দারিদ্র পৃথিবীর বুক থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই মুছে যেতে পারে। ১৯৫০–৫৭ ডলার সংখ্যা তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ঐ সময়ে বার্ষিক কমপক্ষে ১৯০ অবুর্দ ডলার (অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় ৪০০ অর্বুদ টাকা) যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্যে খরচ করা হয়েছে।[১১৯] বার্নল দীর্ঘ আলোচনার পর প্রমাণ করেনঃ

পৃথিবীর সকল অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধনের জন্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, এ অর্থ (অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে যে পরিমাণ খরচ হয়) তার চাইতে অনেক গুণ বেশী।

মোটামুটি এ সব বড় বড় কার্যকারণ দুনিয়ার দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য দায়ী। এ অবাঞ্ছিত কারণসমূহ দুর করাই হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার প্রকৃত সমাধান, জন্মনিরোধ নয়।

৫। জন্মনিরোধ কি সমস্যার কোনো সমাধান

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দীন ও যুক্তির ভিত্তিতে ওপরে যে আলোচনা করা হলো তা থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, ইসলামী শরীয়ত এ বিষয়টিকে কোনো পর্যায়েই সমর্থন করে না। মাত্র কতিপয় ব্যক্তিগত অসুবিধার ক্ষেত্রে বৃহত্তর মঙ্গলের তুলনায় একটি কম ক্ষতিকর বিষয় বিবেচনা করে শরীয়তে এ বিষয়টিকে বরদাশ্‌ত করে নেবার অবকাশ পাওয়া যেতে পারে। আর এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার প্রকৃত অসুবিধা ও সমস্যাবলী যাচাই করে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াবদিহির পূর্ণ অনুভূতিসহ যথারীতি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে জন্মনিরোধ করবে। নিছক ভোগ–লিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্যে এরূপ করা কিছুতেই জায়েজ হতে পারে না। তাই

---

১১৯. বার্নল প্রণীত "World Without War" -21 পৃষ্ঠা

জন্মনিরোধের জন্যে দেশব্যাপী কোন আন্দোলন শুরু ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

উপরন্তু এ আন্দোলনের ফলে যে মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয় তা ধ্বংসাত্মক এবং মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কখনও এ ধরনের আন্দোলনকে দেশের জন্যে কল্যাণকর বলে গ্রহণ করতে পারে না।

এসব কথা সত্য, সন্দেহ নেই! কিন্তু আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম জাহান কিংবা প্রাচ্য দেশগুলোতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ আন্দোলনের সফলতা লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই। এতদ অঞ্চলের সুস্পষ্ট পরিস্থিতিই এর প্রমাণ।

নিছক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলেও এর সফলতা অত্যন্ত অনিশ্চিত মনে হয় এবং এটা যে শেষ পর্যন্ত একটা "বিস্বাদ" অপরাধে পরিণত হবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ সম্পর্কেও যথাযথভাবে চিন্তা-বিবেচনার জন্যে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমত, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোন ইতিবাচন পন্থা নয়। এব্যবস্থার দ্বারা উদ্ভূত অবস্থাকে জয় করার পরিবর্তে অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করা হয় মাত্র। তাই এটা একটা নেতিবাচক পন্থা; আর এর দ্বারা সমস্যার কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। দুনিয়া খাদ্য চায়-জন্মনিরোধ বটী চায় না। এ আন্দোলন আগাগোড়াতেই নেতিবাচক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার কোন ইতিবাচক সমাধান এর মধ্যে মোটেই নেই। এজন্যেই এ আন্দোলন সফল হলেও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের কোন লাভ হয় না- আগে যে স্থানে ছিলো, সে স্থানেই কায়েম থাকে বরং লাভের পরিবর্তে নূতন জটিলতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যদি অত্যন্ত কঠোরভাবেও এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় তাহলেও কম পক্ষে শতাব্দী-অর্ধশতাব্দী পর এর ফল দেখা দিতে পারে। ইউরোপেও এর ফল দীর্ঘদিন পরেই দেখা গিয়েছিলো। তাই এ ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি শীঘ্র দূর হয়ে যাবার কোন আশা নেই। দীর্ঘকাল সম্পর্কে কেনীস্ বলেন যে, আমরা এ বিষয়ে শুধু একটি কথাই জানি। আর তা হচ্ছে এই যে, দীর্ঘকাল পর আমরা সকলে মরে যাবো।"

"In the Long run we all shall be dead."

তৃতীয় কথা হচ্ছে এই যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞান বা অর্থনীতি বিষয়ক কোন পরিকল্পনা নয় যে, যখন ইচ্ছা যে কোন দেশে তা প্রবর্তন করা যেতে

পারে। এর সফলতার জন্যে বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বিশেষ ধরনের নৈতিক অনুভূতি ও বিশেষ ধরনের মানসিকতার (Attitude) প্রয়োজন।

এগুলোর অবর্তমানে এ আন্দোলন চলতেই পারে না। হোরেস্ বেলশ (Horace Belshaw) বলেনঃ

"জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারের ফলে অনেক যুগ পর (After many decades) জন্মহার কমে যাবার আশা করা যায়। এ প্রচারে ধীরে ধীরে জনমত গঠন করবে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় জানা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তন করে জন্মনিরোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করে তোলার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রচারের কোনই প্রভাব আশা করা যায় না।[১২০]

এ লেখক আরও বলেনঃ

"বিভিন্ন ধরনের বাধা ও অর্থনৈতিক এবং কার্যকারণ ঘটিত অসুবিধা এত শক্তিশালী ও প্রভবশালী যে, সীমিত পরিবার সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রচারের পরোক্ষ ব্যবস্থা শীঘ্র ফলদায়ক হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশেও এসব কারণেই এ আন্দোলন অনেক বিলম্বে ফলপ্রসূ হয়েছিলো।"[১২১]

বেলশ–এর সিদ্ধান্ত হচ্ছেঃ

" উপসংহারে আস্থা সহকারে বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে বলে সহজভাবেই আশাবাদী (Qualified Optimism) হওয়া যেতে পারে। অপরদিকে পরবর্তী ২০/৩০ বছরের মধ্যে জন্মহার যে পরিমাণ কমে যাবে বলে আশা করা যায় তা মৃত্যুহার হ্রাসের পরও ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারে আমি অনেকাংশেই নৈরাশ্যবাদী (Qualified Pessmism)"। [১২২]

এজন্যেই লেখক পরামর্শ দেন যে, জনসংখ্যার প্রতি এত বেশী গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপকরণ বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা দরকার। জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর সমর্থক স্যার চার্লস ডারউইন তাঁর সাম্প্রতিক 'দি প্রেসার অব্ পপুলেশ্যান' (The Pressure of Population) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ

---

১২০. Horace, Belshaw, "Population Growth and Levels of consumption" (With Special reference to Countries in Asia) London. 1956. P. 25.

১২১. Horace, Belshaw, Population, Page 41.

১২২. Growth & Levels of consumption, Page 45.

"যত দ্রুততার সঙ্গেই এর (জন্মনিয়ন্ত্রণের) প্রচার চালানো হোক না কেন, এক অর্বদু সংখ্যক লোকের অভ্যাস ও স্বভাব, মাত্র ৫০ বছর সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপ্লবী কায়দায় পরিবর্তন করে দেয়া অনুমানেরও অতীত বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয় সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সকল অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক।........এ কাজটা এমন যে, এর প্রতি উৎসাহ দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ৪০ বছর পরও দুনিয়ার সমগ্র অধিবাসীদের মধ্য থেকে নগণ্য সংখ্যকের চাইতে বেশী লোক যে এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারবে তার কোনই আশা নেই।" [১২৩]

ম্যাককারমুক বলেনঃ

"যে সব দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল এবং অনেক বিস্তৃত এলাকার লোক চিকিৎসা থেকে একেবারেই বঞ্চিত সে সব স্থানে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন অসম্ভব এবং সেখানে এর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই।" [১২৪]

ভারতের জন্মনিয়ন্ত্রণের শীর্ষস্থানীয় সমর্থক ডঃ চন্দ্র শেখর তাঁর এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে লিখেনঃ

" গ্রামাঞ্চলের লেখাপড়া জানা লোকদের নিকট জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার যতটা সহজ, বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত কাজের (জন্মনিরোধ) ব্যবস্থা ততই কঠিন। অবস্থা হচ্ছে এই যে, এশিয়া মহাদেশের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থার দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। লক্ষ লক্ষ ঘর এমন রয়েছে যাতে কোন পানির নল বা গোসলখানাও নেই। ও সব ঘরে গোপনীয়তা রক্ষা করার মত কোন স্থান পর্যন্ত নেই। গ্রাম গুলো ডিস্পেনসারী এবং চিকিৎসালয় থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এবং যে সব স্থানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু ব্যবস্থাদি রয়েছে সেখানেও দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, স্থবিরতা ও নিস্ক্রিয়তাজনিত অসুবিধা ও জটিল সমস্যাবলী রয়েছে (যেগুলো জন্মনিরোধের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়)।"

"এগুলো হচ্ছে সাধারণ অসুবিধা। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, ধর্মীয় বিশ্বাস, বংশগত রীতিনীতি, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া, পারিবারিক অবস্থা এবং এ ধরনের অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো জন্মনিরোধকে গ্রহণ বা বর্জন করার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের সরলভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে, দুনিয়ায় ঘনবসতিপূর্ণ

---

১২৩. Darwin, Sir Charles, The Pressure of Population What's New? No. 210.1958. P. 3.

১২৪. ম্যাককারমুক প্রণীত পূর্বোল্লেখিত পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠা।

এলাকার অধিবাসীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। এজন্যে ভারতের পর্ণ কুটির, চীনের কুড়ে ঘর এবং বার্মার গ্রাম্য বাড়ীতে অস্ত্রোপচার, জন্মনিরোধের উপকরণ ও ঔষধপত্র এবং এগুলোর ব্যবহাররোধকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টায় শত শত বছর ব্যায়িত হবার আশংকা রয়েছে।"[১২৫]

আমেরিকার অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রিচার্ড মিয়ার (Richard Meer) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, অনুন্নত দেশগুলোতে জন্মনিরোধের উপকরণ ছড়ানো একটা অদ্ভুত বিষয়ে পরিণত হবে। তিনি এ ব্যবস্থার কোন ত্বরিৎ ফল লাভের মোটেই আশা রাখেন না। এতদ্ব্যতীত তিনি এমন সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করেন যেগুলো বর্তমান থাকা অবস্থায় জন্মনিরোধ প্রচেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হতে পারে না। এর পর তিনি লিখেছেনঃ

এ ধরনের অবস্থা শুধু সেই সমাজেই কায়েম হতে পারে যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত। যে সমাজে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নে এবং যেখানে কোন উপায়ে বেঁচে থাকার নামই জীবন, সেখানে জন্মনিরোধ পছন্দনীয় বা সফল হয়েছে–এমন একটি নজিরও দুনিয়াতে পাওয়া যায় না।"[১২৬]

বর্তমানের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারাও বিশেষজ্ঞদের উল্লিখিত অভিমতেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। জাপান ও পৌরটো রিকুতে (Purto Rico) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোটি কোটি টাকা খরচ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবর্তন ও জন্মনিরোধ ঔষধপত্রাদি ছাড়ানো হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থানেই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে জাপানে গর্ভপাত (Abortion) এবং পৌরটো রিকুতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বন্ধ্যা করে দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।[১২৭]

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ–

- প্রাচ্য দেশগুলোতে কার্যকরী করা অসম্ভব।
- এর যাবতীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।
- আর যদি সফলও হয় তবু এর ফলাফল প্রকাশ হ'তে ৫০ থেকে ১০০ বছর সময় দরকার। আর এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

---

১২৫. Chandra Sekhar, Dr. Sripati, Hungry People and Empty Lands, London 1956 P. P. 252-253.

১২৬. Richard Meer, L, Science and Economic Development, Massachusetts, 1956, Page 143.

১২৭. ম্যাককারমূক প্রণীত পূর্বোল্লিখিত পুস্তক ৬৪–৭১ পৃষ্ঠা, ৮৬–৮৭ পৃষ্ঠা।

এ আন্দোলনের ব্যর্থতার অপর একটি কারণও আছে যা বিবেচনার যোগ্য। জন্মনিরোধের যে সব উপকরণ এ যাবৎ আবিষ্কার করা হয়েছে তার সবকয়টিই খুব ব্যয়সংকুল ও অপচয়কারী।

সম্প্রতি ইংলন্ডের লর্ড পরিষদে (House of Lords) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি চিন্তাকর্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক চলাকালে জনৈক বক্তা বলেন,

"ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, জন্মনিরোধ উপকরণাদি ব্যবহার অত্যন্ত ব্যয়সংকুল। জনৈক চিকিৎসকের উক্তি নকল করে তিনি বলেন–

"কথাটা শুনতে যতই আশ্চর্যজনক মনে হোক না কেন, বাস্তব সত্য এই যে, গ্রামাঞ্চলে একটি শিশুর জন্ম দানের জন্যে তত টাকা ব্যয় করতে হয় না যত টাকা ব্যয় করতে হয় জন্মনিরোধ উপকরণাদি হাসিলের জন্যে।"

এ বিতর্কেই লর্ড কেশী ডাঃ পার্কস–এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "নুতন আবিষ্কৃত বটীগুলো ব্যবহারের নিয়ম এই যে, প্রতি মাসে অন্তত ২০টি সেবন করতেই হবে। এশিয়ার পল্লী অঞ্চলের নারীদের জন্যে স্থায়ীভাবে নিয়মিত এতোগুলো বটী সেবন রীতিমত কষ্টকর, এমন কি অসহনীয়। জন্মনিরোধের অন্যান্য উপকরণও কার্যকরী নয়। কারণ এ সবের কতকগুলোতে কোন প্রকার ক্রিয়াই করে না, আর কতগুলো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং অবশিষ্টগুলোর ব্যবহার–বিধি অত্যন্ত কষ্টকর।" [১২৮]

আজকাল জন্মনিরোধক যে বটীটির বেশী প্রচার চলেছে তা ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত হচ্ছে, প্রতি মাসে ২০টি বটীর এক পূর্ণ কোর্স ব্যবহার করা। একদিন ব্যবহার করা বাদ দিলেই পূর্ণ কোর্স ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক মহিলাকে বছরে মোট ২৪০ টি বটী গলধঃকরণ করতে হবে এবং তারপরই সন্তান জন্মাবার 'বিপদ' থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। একটি বটীর দাম ৫০ সেন্ট। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, প্রত্যেক মহিলাকে প্রতি বছর ১২০ ডলার (প্রায় ৫৪০ টাকা) মূল্যের ঔষধ সেবন করডত হবে।[১২৯] ১৯৬০–৬১ সালের পরিসংখ্যান মুতাবিক পাকিস্তানের নাগরিকদের বার্ষিক আয়ের গড় মাত্র ২৪৪ টাকা।[১৩০] এমতাবস্থায় প্রত্যেকটি মহিলা শুধু বটী খরিদ করার জন্যে প্রাত বছর ৫৪০ ঢাকা কিভাবে খরচ করবে তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

---

১২৮. British Medical Journal, London, July 8, 1961, Page 120.

১২৯. ডন মারে (Don Murry) লিখিত প্রবন্ধ "How Safe are the New Birth Control Pills?" Coranet, অক্টোবর ১৯৬০ থেকে গৃহীত।

১৩০. Economic Survey and Statistics Budget 1961-62 Government of Pakistan, Table. 1. Page 1.

এখন আমাদের সামর্থ্য ও উন্নয়ন খরচের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখুন আমরা এ দামী বটী হজম করতে পারবো কি না। এ বিপুল পরিমাণ সম্পদ জন্মনিরোধের জন্যে খরচ করার পরিবর্তে উৎপাদন বাড়ানো ও উন্নয়নের জন্যে খরচ করতে আপত্তি কেন?

৬। প্রকৃত সমাধান

উপরিউক্ত আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি? এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, উৎপাদন বাড়ানো এবং অর্থনেতিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণাদির উন্নয়নের মধ্যেই এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত। আর সত্য কথা এই যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোকেই সমাধান বলা যেতে পারে। জন্মনিরোধক সমাধান বলা, সমাধান শব্দটিরই অপমান।

সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে পরাজয় বরণ অর্থাৎ আমরা মানুষের যোগ্যতা ও বিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে উৎপাদন ও উপকরণ বাড়ানোর পরিবর্তে মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দিতে শুরু করবো। একটি কাপড় কারো শরীরে ঠিকমত ফিট্ না হলে কাপড়টিকে বড় করার পরিবর্তে মানুষটির শরীর কেটে ছেঁটে ছোট করার মতই জন্মনিরোধ ব্যবস্থা অন্যায় ও অস্বাভাবিক।

জন্মনিরোধ মতবাদের পেছনে যে দৃষ্টিভংগী রয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাতে মানুষ চরম লক্ষ্য নয়, বরং নিছক একটি উপায়মাত্র। যেভাবে অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ চাহিদা মুতাবিক বাড়ানো ও কমানো যেতে পারে তেমনিভাবে মানুষের সংখ্যাও কমানো বাড়ানো যেতে পারে। বল, ব্যাট ও জুতা যেমন প্রয়োজন অনুসারে তৈয়ার করা হয় মানুষও তেমনি বিশেষ পরিমাণ অনুসারে জন্মানো হবে অর্থাৎ মানুষ এমন পর্যায়ে নয় যে, তার প্রয়োজন মুতাবিক দ্রব্য–সামগ্রীর ব্যবস্থা করা যাবে, বরং দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে খোদ মানুষকে কাট–ছাট করে নিতে হবে। অন্য কথায় মানুষও বাজারের অন্যান্য দ্রব্যের মত একটি পণ্যদ্রব্য (Commodity) মাত্র এবং এর বেশী কোন মর্যাদার অধিকারী সে নয়।

এ দৃষ্টিভংগী নিতান্তই ভ্রান্ত। সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার পরই মানুষ এতটা নিম্নে নেমে আসতে পারে। মানুষই হচ্ছে সৃষ্টির আসল লক্ষ্য। আর অন্য সকল দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে সৃষ্ট। এ মর্যাদাকে উলটিয়ে দিলে স্বীয় মর্যাদার আসন থেকে মানুষের পতন হবে। মানুষের আসন থেকে নেমে এসে মানুষ বস্তুগত উন্নতির ও সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হলেও

এতে মানুষ হিসাবে লাভ কি হলো? অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক পাকিস্তানের অর্থনীতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে এ ধরনের দৃষ্টিভংগীর সমালোচনা প্রসংগে তিনি লিখেছিলেনঃ

"কিছু সংখ্যক লোক বলে যে, অর্থনৈতিক অবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো অথবা সংখ্যার স্থিতিশীলতা আনয়ন অথবা নিম্নগামী হারের দাবী পেশ করছে। আমি এসব প্রস্তাবের কোন একটিকেও বিন্দুমাত্র বিবেচনার যোগ্য মনে করি না। আমার অভিমত এই যে, অর্থনৈতিক উপকরণ অনুপাতে জনসংখ্যাকে কাটছাঁট করার পরামর্শ না দিয়ে অর্থনীতিবিশারদদের উচিত মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে অর্থনীতিকে সংগতিশীল করে তোলার পরামর্শ দান করা। মাতাপিতা নিজেদের মরজী মুতাবিক সন্তান জন্মিয়ে থাকেন। কোন অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ, তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন এবং উজীরে আজম, তিনি যত জবরদস্ত হোন না কেন, মাতাপিতাকে নিজের মরজী মাফিক সন্তান জন্মানোর ব্যাপারে বাধা দান করার অধিকারী নন। অপর দিকে সকল অধিকার অপর পক্ষের রয়েছে। অর্থনীতিবিদ ও উজিরে আজমদের ওপর মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার উপযোগী অর্থনৈতিক উপকরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ করার জন্যে চাপ দেওয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে প্রত্যেক সন্তানের পিতার।"[১৩১]

আমাদের দৃষ্টিতে উৎপাদন বাড়ানো ও অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান রয়েছে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবকাশও রয়েছে যথেষ্ট। এখন শুধু সাহস, যোগ্যতা, সঠিক পরিকল্পনা, বাস্তব কর্মচেষ্টা ও তৎপরতার প্রয়োজন। ভিত্তিহীন আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যকে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হলে দুনিয়ার অন্যান্য উন্নত দেশের চাইতেও উন্নত মান কায়েম করতে না পারার কোনই কারণ নেই।

আমাদের সাহসের অভাব ও অযৌক্তিক ধরনের হীনমন্যতাই প্রকৃত সমস্যা। অন্যথায় প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জন্যে যাবতীয় উপকরণ মওজুদ আছে। এগুলোকে যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করে আমরা দুনিয়াকে পুনরায় সবক দিতে পারি।

---

১৩১. Colin Clark. Report, A General review of Some Economic Problems of Pakistan, 1953, P. 2.